



Digital Proofer

### Jhumri

Authored by Mrs Gargi Bhattach...

5.0" x 8.0" (12.70 x 20.32 cm)  
Black & White on White paper  
290 pages

ISBN-13: 9781545495575  
ISBN-10: 1545495572

Please carefully review your Digital Proof download for formatting, grammar, and design issues that may need to be corrected.

We recommend that you review your book three times, with each time focusing on a different aspect.

- 1 Check the format, including headers, footers, page numbers, spacing, table of contents, and index.
- 2 Review any images or graphics and captions if applicable.
- 3 Read the book for grammatical errors and typos.

Once you are satisfied with your review, you can approve your proof and move forward to the next step in the publishing process.

To print this proof we recommend that you scale the PDF to fit the size of your printer paper.

# ঝুমরি

## গার্গী ভট্টাচার্য

ক্যানবেরার সুন্দর সুন্দর পাহাড় ও

লাল নীল অশ্বদের-----

Copyright © 2017 Gargi Bhattacharya

All rights reserved.

Contact Details --- TeaTree25@outlook.com

This book is entirely a work of fiction. The names, characters, organizations and incidents portrayed in it are the work of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, events or localities, is entirely coincidental.

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author.

The views expressed in this book are entirely those of the author. The printer/publisher, and distributors of this book are not in any way responsible for the views expressed by the author in this book. All disputes are subject to arbitration; legal actions if any are subject to the jurisdictions of courts of Canberra, Australia.

First Published: April 2017

Cover Design: Gargi Bhattacharya

Images :: [pixabay.com](http://pixabay.com) under CCO creative commons license and MS WORD Clipart images.

Distributed by Amazon Worldwide Distribution

Gargi's youtube channel : shalpia network

Current videos ::

1. Marwa
2. Neel Bharani
3. Fagun Kuasha
4. Maya Horin
5. Pushpito Jonaki

**Her writing has been used as an example in the creative writing classes of a Calcutta based school...Noted Indian mainstream publisher Dey's Publishing has marketed many of her books.**

All of her books published by Power Publishers (12 books) will always be available on <http://www.purushottam-bookstore.com/> and

<http://www.power-publishers.com/>

**Books by the author : (Years active 2006-17 ) BOLD=BEST SELLER**

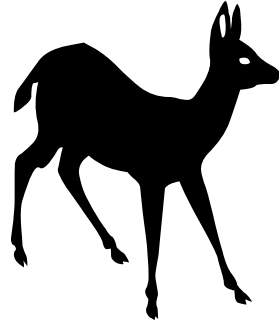
1. Chander mohuabone ( as Chander coffee shope)
2. Maya horin
3. Fagun kuasha (as Hemanter bishh)
4. Mayurkonthi bolkol
5. Neel bharani
6. Pishach
7. Machhranga
8. Mrigashira(as Digital Polash)
9. Andolika
10. Tofu tring
11. The clay egg (as The egg & Kindle version of The Clay egg )
12. Pushpito jonaki
13. Ghumpahari aator
14. Tuhinrekha
15. Kamakshi
16. Ava Cho
17. Chameli phool
18. Fungus
19. Hemate
20. Gothic Church

21. Phobia
22. Afgani
23. Jharbati
24. Radhachura
25. Mom rong
26. Domru
27. Cordless Hathpakha
28. Megh jochhona

=====

29. Mehgony homshikha
30. Bhooter boi doll putul
31. Pekhom buro
32. Kankhe Gagori
- ( a collection of previously published novellas )
33. Jhumri – collection of previously published micro stories....





## ঝুমরি

গুরুমারা ড্যামের কাছেই আছে বনজ মানুষের ডেরা । ওরা রিংপিং আদিবাসী । ক্যানবেরা শহরের অনতিদূরেই এই অরণ্য ও ড্যাম । সিভিল ইঞ্জিনিয়ার শিবার্ঘ্য এসেছিলো এই দেশে কাজের আশায় । ভারতের বিল্ডিং বানানোর সময় ইট, বালি , সুড়কি, কনক্রীট ইত্যাদিতে ভেজাল মেশানো আর তারপর বাড়ি ভেঙে অনেক মানুষ মারা যাওয়া কিংবা মিস্ত্রী আর কারিগরদের নিহত হওয়া এক আজব কাণ্ড বলে মনে হত শিবার্ঘ্যের । কাজেই সে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে এই পরবাসে এসে হাজির হয় । মধ্য চল্লিশে এসেছিলো বলে কাজের সমস্যা হয়েছিলো ।

বিল্ডিং ইন্সপেক্টর হিসেবে কাজ করলেও স্বচ্ছল জীবন যাপনে সক্ষম ছিলো না । বাকি জীবনটা তাই অভাবেই কাটে । পরে ক্যাণ্ডারর পকেটে করে ড্রাগস্ চালান করে কাটায় । ধরা পড়ার আগেই কাজ ছাড়ে , আর করেনা । স্ত্রী চায়নি দেশে ফিরে যেতে । কাজেই ওরা মেনস্ট্রিম সমাজে না থেকে আদিবাসীদের সাথে মিশে যায় ।

ওদের মধ্যে , অতি অল্প মাইনেতে নির্মাণ কর্মী হিসেবে কাজ করতো শিবার্থ্য । একমাত্র কন্যা সাহানা বেড়ে ওঠে আদিবাসিদের সাথে ।

স্ত্রী রেণু মারা গেলে সাহানা বাবার দেখাশোনা করতে শুরু করে । পরে এক আদিবাসি যুবক, পরাগের সাথে থাকতে শুরু করে । ওদের মধ্যে বিয়ের তত চল নেই । কেউ কেউ করে । কেউ করেও না । পরাগ আর সাহানা বিয়ে করেনি । ওদের এক মেয়ে পিয়া । পরাগের আসল নাম পর্গা । ওকে সাহানারা পরাগ ডাকে । গুরুমারার মতন আমাদের গরুমারা ফরেস্ট আছে কাজেই অনেক আদিবাসি নামও মিলে যায় আমাদের সাথে । যেমন ডাকু, পানু, পিলি, রিংঝি , বিন্দি, মীরা , নিলি, সুরি ইত্যাদি ।

পরাগ ও সাহানার মেয়ে , পিয়া স্কুলে পড়ে । ওদের আরেক মেয়ে আছে । নাম তার ঝুমরি ।

দুজনের বয়স প্রায় কাছাকাছি । ১৫ /১৬ ।

পরাগ আজকাল মানুষকে গাইড করে । ওদের আদিবাসি সভ্যতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে । টুরিস্ট গাইড ।

একটা পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পথ মাঝে । সেই পাহাড়টি আদতে এক আদিবাসি রাজকন্যে ।

ওদের প্রিন্স্ট , ওকে পাহাড় করে দেয় মায়াবলে । জাদু দণ্ড ছুঁইয়ে । সেইসব গল্প বলে পরাগ ।

আমাদের যে এই কাহিনী শোনাচ্ছে সে কিন্তু মানুষ নয় । তার পরিচয় নতুন করে দেবার কিছু নেই কারণ সে না থাকলে সেইভাবে কিছুই থাকতো না । সে হল সময় ।

**আমরা সময় এর কাছে এই গল্প শুনছি ।**

**সময়ই একমাত্র পারবে এই গল্প , খাঁটি ভাষায় শোনাতে ।**

ঝুমরিকে দেখে মনে হয় আদিম যুগের মানুষ । অনেকে ওকে বনমানুষও ভাবে । ও অল্প অল্প কথা বলে। আকার ইঙ্গিত করে । স্নেটে লেখে । দুই হাতে তামার বালা পরা ।

হাসে, কাঁদে , ভালোবাসে । **ঝুমরি ; এক চীনা যুবককে মন দিয়েছে** । তার নাম গ্রেগরি ।

এখানে এসে অনেক চীনা মানুষ- ওদের আজব নাম বদলে ইংলিশ নাম নিয়ে নেয় ।

গ্রেগরিও সেরকম একজন । ও এখন বনে থাকে । পরাগের সহকারি । গাইড । জুনিয়র গাইড । হাতে লণ্ঠন নিয়ে গাঢ় সন্ধ্যায়, বনপথে চলাফেরা করে একদা শহুরে গ্রেগরি ।

চীনদেশ থেকে এই দেশে আসে । পরে অরণ্যের ডাকে আদিবাসি সমাজে গিয়ে মেশে । **ওকেই মন দিয়েছে ঝুমরি** ।

এখন ঝুমরি নিয়মিত পিরিয়ডের কবলে পড়ে। প্রথম যখন এর স্পর্শ পায় তখন উৎসব করেছিলো সাহানা। সবাইকে জানানোর জন্য যে তার আরেকটি মেয়ে আজ থেকে বড় হল!

ঝুমরি তো গ্রেগরির জন্য পাগল! ওকে ডাকে শিস্ দিয়ে, চুমু দেয় আর মাথায় চাটি মেরেও ডাকে!

গ্রেগরি কিছুতেই ওকে বিয়ে করবে না। কারণ ঝুমরি এক যুবতী বনমানুষ, যার বিবর্তন হয়েছে প্রবল ভাবে এবং সে মানবী হয়ে উঠেছে মানুষের স্পর্শে! তার নিয়মিত রক্তক্ষরণও হচ্ছে মেয়েদের মতনই।

**জিনের চেয়েও পরিবেশ এইক্ষেত্রে বেশি শক্তিশালী।**

মানুষের মাঝে থাকতে থাকতে সেও মানুষ!

কিন্তু গ্রেগরি তো উন্মাদ নয়; তাই এই বিয়েতে রাজিও না।

**বলে :: আমি ঝুমরিকে খুব ভালোবাসি কিন্তু প্রেমিকার মতন নয়  
---বন্ধুর মতন-----স্ট্যান্ডার্ড ডায়ালগ।**

ঝুমরি নাওয়া খাওয়া ছেড়েছে। গ্রেগরিকে চাটি মেরে মেরে ওর হাতে কড়া পড়ে গেছে। তবুও ছেলে ভুলানো সহজ নয়!

**একদিন হঠাৎ, বিষধর সাপের ছেবলে প্রাণ গেলো গ্রেগরির!**

এই বনে অনেক সাপ। ঝুমঝুমি নামে এক সাপ আছে। তারই ফণায় প্রাণ গেলো!

ঝুমরি কেঁদে ভাসাচ্ছে! সাহানারও বুক ফাটছে মা হিসেবে!  
**মরেই গেলো তাজা ছেলেটা আর ঝুমরি মেয়েটা এই শোকে প্রায়  
আধমরা!!**

তবুও কিন্তু বিয়ে হল গ্রেগরির সাথেই। চীনামানুষ আর অন্যান্য বহু মানুষদের ক্ষেত্রে বিয়ে হয় মৃত্যুর পরেও। যোস্ট ম্যারেজ বা প্রেতের বিয়ে বলা হয় একে! ভূতের বিয়ের জন্য অনেক মৃতদেহ চুরিও হয়।

যদি কোনো কারণে জীবিত অবস্থায় বিয়ে সম্ভব না হয় তখন মৃতের দেহকে সাজিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়। এতে আত্মার শান্তি হয়।

গ্রেগরিকে বর সাজিয়ে বিয়ে দিলো সাহানা, নিজ কন্যা ঝুমরির সাথে! গ্রেগের অনুমতির কোনো দরকারই নেই এখন!

ঝুমরি খুব খুশি! বারবার মৃত গ্রেগরির মাথায় চাটি মারছে আর প্রেত ওঠে চুম্বন দিচ্ছে! হয়ত একত্রে, স্বর্গলাভের আশায়।

**বনমানুষ থেকে মানুষ হয়ে ওঠা ঝুমরি হঠাৎই যেন ভাগ্যের  
খেয়ালে হয়ে উঠলো প্রতিনী; অদৃশ্য এক জাদুবলে!**

**Metamorphosis!!**



## হনন

আজকাল মুসলিম দেখলেই লোকে ভয় পেয়ে যায় ।

কাজেই বিদেশে, অফিসের মুসলিম সহকর্মীর সাথে লোকে একটু দূরত্ব রেখে চলে বিশেষ করে সে যদি পাকিস্তানের হয় !

আমাদের দেশের মেয়ে সোমা, সোমা মিত্র একজন ডিজাইন কর্মী । বিদেশে একাকী থাকে । সোসাল লাইফ প্রায় জিরোতে ।

চাকরি করে সময় পায়না তার ওপর এখানে সমস্ত কাজ নিজেই করতে হয় । নেহাতই ধনী নাহলে কেউ বাড়িতে চাকর রাখেনা । সোমা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে কাজেই সব কাজ নিজেই করে । অফিসের মুসলিম সহকর্মীর সাথে হাই হ্যালো পর্যন্তই । এর বেশি মেলামেশা করা কিংবা খেজুড়ে আলাপ তার একেবারেই না পসন্দ !

ভারতে থাকতে ইচ্ছে ছিলো প্রথম বিশ্বের নাগরিক হবার , সেখানে বসবাস করার । কিন্তু এখানে এসে ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করে - সরকারি দপ্তরে একজন স্ট্যাম্প ডিজাইন কর্মী রূপে কাজ করলেও

সোসাল লাইফ একদম শূন্যতে । তার কারণ এখানে ওর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই আর অফিসে ও একমাত্র ভারতীয় । পাকিস্তানের কিছু মানুষ আছে কিন্তু ও তাদের সাথে মেলামেশা করেনা । যদি তাদের মধ্যে কেউ উগ্রসংস্থার সাথে জড়িত থাকে !

**ও শিল্পী মানুষ তো তাই ওর বাসাটা খুব সুন্দর জায়গাতে ।**

হাল্কা ইউক্যালিপ্টাস্ বনের একদম মধ্যখানে ওর বাড়ি বা কটেজ । চারদিকে বারান্দা । দিনের বেলায় কাজে থাকে । বিকেলে ও ভোরে বারান্দায় বসে কফি/চা পান করতে করতে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে । অজানা পাখির ডাক , বন্য পশুর চীৎকার আর বুনো ঝর্ণার কলকল শব্দের স্পর্শে কাটে ওর প্রতিটি দিন । একাকীত্ব গ্রাস করে রাতে । বলা ভালো সন্ধ্যার পরেই ।

শীতকালে ফায়ারপ্লেসে কাঠ দিতে দিতে নানান বই পড়ে ।

ছুটির দিনে বিভিন্ন পদ রান্না করে । এইভাবেই নির্জন জীবন যাপন করে । কিছু দূরে থাকে এক শিকারি । তাকে দ্যাখে । লোকটি সাহেব নয় । বাদামী রং । কালো নয় । মুখে দাঁড়ি , গোঁফ ।

লম্বা গড়ন । কোনো কথা নেই । চুপচাপ একদম ।

এই বনবাসরে, একা এক নারীকে দেখেও কোনো কৌতুহল নেই তার । মেন লাভ উইমেন , দে হেট স্মেন্স্ এটা এতদিন জানতো কিন্তু এখন দেখছে এর উল্টো ।

একদিন যেচেই আলাপ করলো সোমা । লোকটির নাম সোমদত্ত সেন । শিকারি । ফিজিতে থাকতো । আদতে ভারতের মানুষ ।

এখন বনে জঙ্গলেই থাকে । ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব বাড়ে । জানা যায় ওর বাবা আসলে মুসলিম । মা হিন্দু । দুজনের বিয়ে সম্ভব হয়নি । বাবা অন্য মেয়েকে বিয়ে করেন পরিবারের ইচ্ছায় । পরে ওর জন্মদাতার স্ত্রী, মুসলিম মা ওকে দত্তক নেন । সমাজের কটুভাষণে ঘায়েল হয়ে গর্ভধারিণী, হিন্দু মা ততদিনে মৃত্যু ।

**সোমদত্তর মা এখন থেকে সায়ারা বেগম ।** শিকার থেকে ছুটি নিয়ে ফিজিতে যায় মাঝে মাঝে । বাবা যতদিন ছিলেন প্রায়ই যেতো । এখন কম যায় । সমাজের বাইরেই ভালো আছে । নিজের মায়ের কথা মনে হয় সবসময় তাই নিজেও একা বনে থাকে ।

নামেও হিন্দুত্ব বজায় রেখেছে গর্ভধারিণীর জন্যই ! উনি সেন ।

বলে ::: পশুরা মানুষের থেকে ঢের ভালো ।

একবার এক সিংহ শাবককে এক পোচারের হাত থেকে বাঁচায় । শাবকটি ঘায়েল হয়ে, অসম্ভব জখম নিয়ে , শুয়ে কাঁতরাচ্ছিলো । সোমদত্ত তাকে বাঁচায় , সেবাসুশ্রবসা করে ।

বড় হবার পরেও, সে নাকি নিয়মিত এসে সোমদত্তর সাথে দেখা করে যায় এই বনেই ।

এইসব চমৎকার পশুকাহিনী ও মানুষের হিংস্রতার কাহিনী শুনে সময় কাটায় সোমা । **সন্ধ্যার পর আর একা লাগে না ।**

--সোমা জল্দি চা করো , অথবা চট্ করে এক কাপ কফি বানাও দেখি, বেগুনি হবে নাকি আজ ? আমি টাটকা বেগুন কিনে এনেছি ফার্মাস মার্কেট থেকে ! সোমদত্তর মেঘের মতন গলার স্বর শুনে নীরব বনবনাস্তর কেঁপে ওঠে !

### সামাজিক হয়ে ওঠে সোমা !

ওরা বন্ধুত্ব করে ; পথপাশ থেকে তোলা একটি ঝাউপাতা নিয়ে - তাতে দুজনের কাল্পনিক নাম লিখে, বাতাস কলম দিয়ে ।

আগে সূর্য ডুবলে বড় একা লাগতো । আজকাল সন্ধ্যার জন্য মুখিয়ে থাকে । শিকারের গল্প, শিকারির গল্প সব শুনতে পাবে যে !

মুসলিম স্পর্শে ওর লোনলি জীবন ভরে ওঠে রং মশালের আলোতে । ও জানতে পারলো যে ফিজিতে-ওদের বাসায়, ওরা গরু খায়না । গরুর পুজো করে কারণ গরু অনেক উপকার করে আমাদের দুধ দিয়ে, হাল টেনে , গাড়ি টেনে । উপকার করছে অনেকদিন ধরে । পাকিস্তানে নাকি মিঠি নামক এক মিঠি মিঠি গ্রামে, মুসলিম মানুষ গরু জবাই করেনা । হিন্দু মুসলিম মিলে মিশে থাকে । **সোমার জীবনও এই মানুষটির স্পর্শে আশ্চর্য ভাবে বদলে গেলো । মুসলিম দেখলে আর ভয় পায়না ।** ভারতে, কিছু রাজনৈতিক দল যা শুরু করেছে তাতে করে ভারতও আস্তে আস্তে পাকিস্তানের মতন ভয়াল দেশ হয়ে উঠতে পারে বলে সোমদত্ত জানালো । সোমদত্তের পরশ মায়াময় , মুসলিম নয় মসলিন কাপড়ের মতন । মনের বিভিন্ন গম্ভীর যার ছোঁয়ায় ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেছে । ওর সঙ্গ ভালো লাগে । সোমদত্ত, সোমাকে মানুষী করে । স্পন্দন ভরে ওর চেননায় । যা কেবল লাব্‌ডুব্‌ লাব্‌ডুব্‌ শব্দ নয় , জীবন আকাশে রামধনু সৃষ্টি করে -- হনন করেছে সোমদত্ত , তার একাকীত্বের বিষাদকেও । মৃত আজ নীরবতা , কথা ঝরেছে বন্ধলে , ভীষণ শূন্য এই নীলাঞ্জন বনাস্তে ।

## পাভলি

পাভলি একটি ছোট্ট স্টেশান । ধূ ধূ অঞ্চলে কিছু গ্রাম আর এই স্টেশান । মাত্র দুটি ট্রেন যায় এখান দিয়ে । একটি মালগাড়ি , সকালে আর রাতে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন ।

তবে বেশিরভাগ সময়ই যাত্রীবাহী রেলগাড়ি ফাঁকা যায় ।

কেন যে রেল কোম্পানি এই ট্রেন স্টেশানটি রেখেছে এখানে কে জানে ! তার কারণ মালগাড়িটি অন্য রাস্তা দিয়েও চলে যেতে পারে । সে যাইহোক এখানে এক স্টেশান মাস্টার কাজ করে যার আদিবাড়ি বাংলার দক্ষিণে । ভদ্রলোক অনেক পড়াশোনা শিখে এইদেশে আসে কিন্তু কৈশোর থেকেই ওর স্বপ্ন ছিলো একটি ছোট্ট স্টেশানে , স্টেশান মাস্টার হয়ে কাজ করার ।

দেশে ; পরিবারের চাপে লেখাপড়া শিখতেই হয় কিন্তু বিদেশে এসে পেশা বদলে ফেলে ।

এই ছোট্ট স্টেশানটায় রাতে গ্যাসবাতি জ্বলে ।

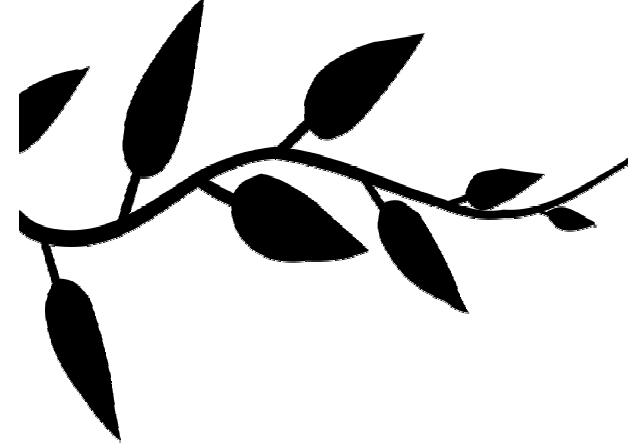
মানুষটির নাম ভানু আইচ । আইচ বিয়ে করেনি । চাকরি, পুঁথি পড়া আর ঘরের কাজ করেই দিন কাটায় । দেশেও যায়না কারণ ওখানে কেউ নেই এখন । বাবা ও মা স্বর্গে গেছে । ভাইবোন যে যার নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত !

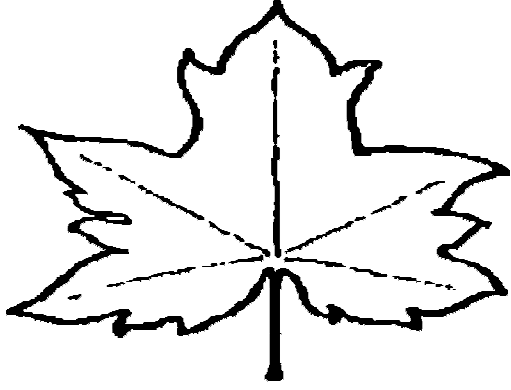
মাঝে মাঝে এই রুট দিয়ে কিছু ট্রাক্ যায় । রেল লাইনের পাশেই রাস্তা । গ্রাম থেকে এসে একটি পাঞ্জাবী পরিবার এখানে একটি ধাবা খুলেছে । সেখানে ট্রাক ড্রাইভারেরা অনেকেই বিশ্রাম নেয় । ধাবায় বিরিয়ানি পাওয়া যায় । সেই লোভেও আসে অনেকে । তবে গ্রামের লোক এদিকে আসেনা বড় একটা ! তাদের মধ্যে বেশিরভাগই সাহেব ।

এরকমই এক ট্রাক ড্রাইভার দিলদার সিং । সে ভানুর বন্ধু হয়ে উঠেছে । ঘটিবাটি বিক্রি করে এখানে এসেছে । এখন ট্রাক চালায় ।

রাতের ট্রেনটা চলে গেলে ভানু আর দিলদার গল্প করতে বসে ।

ভানু ওয়াইন আর ভালোমন্দ খানা সাজিয়ে বসে । দিলদার ঘুমন্ত চোখে চায় ! ক্লান্ত হলেও মদ খেয়ে ঢলে পড়েনা । অনবরত গল্প করে । ওর ভাঙারে অনেক গল্প থাকলেও- ও একটাই গল্প শোনায় ভানুকে । ওর স্ত্রীকে, ওরই আপন পিতা কী করে আশুন জ্বালিয়ে দিয়ে মারলো । ওর বৌ ছিলো জাঠ্ । তাই ওর বাবা প্রথম থেকেই আপত্তি করেছিলো । শেষকালে দিলদারের জেদের কাছে লোকটি নুইয়ে পড়ে । পরবর্তী কালে বৌকে জ্যাস্ত পুড়িয়ে মারে । তার আগে অবশ্যই সারা গ্রামে তাকে নগ্ন করে ঘোরায় । এই ঘটনার পরে দিলদার বিদেশে চলে আসে । ট্রাক চালায় । আর এই একই গল্প বলে যায় নিয়মিত ভানুকে । **সূর্য ডোবা রাতে , একই গল্প শুনে শুনে, ভানু আইচ একটুও বিরক্ত হয়না এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের !**





## সবুজ গুহা

সবুজ গুহার আসল নাম সবুজ শাখা গুহ। পেশায় শিক্ষক এই মানুষটি একটু প্রাচীন পন্থী। ছাত্রদের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয় সবুজ একা থাকে। স্ত্রী দেশে ফিরে গেছে আর একমাত্র পুত্র এশিয়াতে মারা গেছে। যুদ্ধে গিয়ে। সৈনিক ছিলো।

সবুজের পড়শী মিসেস কালাহান্ আর তার মেয়ে রোজালিন্ডা, পাশের সুবিশাল বাগান-বাড়িতে বহুদিন ধরেই আছে। রোজ মানে মেয়ে, বিয়ে করেছিলো এক এশিয়ানকে। বিচ্ছেদ হয়ে গেছে কারণ লোকটি অসম্ভব কন্ট্রোল ফ্রিক। তার ধারণা সেই সবকিছু বেশি বোঝে এবং উত্তম তার বিচার ব্যবস্থা।

--আমাদের দেশে মেয়েদেরকে এইভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়না যে তারা পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশে কম কিছ। রোজ বলেছিলো সবুজকে। কালাহান্ পরিবারের ধারণা- এশিয়ান মানেই উজবুক ও স্বেচ্ছাচারী। মেয়েদের ওরা পোষ্য মনে করে।

**সবুজশাখা গুহও এই ধারণা বদলাবার চেষ্টা করেনি।**

একটি অপরূপ, লাল ফুলের গাছ ওদের বাগান থেকে সবুজের ব্যাড়ার পাশে ঝুঁকে ছিলো। বসন্ত আসছে কিনা, শীতের পদধ্বনি-সবকিছু ঐ গাছের সাজসজ্জা দেখলেই বোঝা যেতো।

বড় বড়, থোকা থোকা লাল ফুলে ছেয়ে যেতো- বছরের অর্ধেক সময়। অন্যসময় সবুজ সবুজ, কচি ও সতেজ পাতা মনে রং লাগাতো। **যৌবনের কলি ফুটে উঠতো লাল রঙা এই বৃক্ষের দিকে চাইলে।** মন মছায় ব্যাঘাত ঘটলো, ঝড়ে গাছটি একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ায়।

কালাহান্ গিল্লী এলেন দুপুরে। সবুজ শাখা এখন নাইট কলেজে পড়ায় তাই দুপুরে বাড়িতেই থাকে। মহিলা বলে গেলেন যে কম্পান্সেশানের অর্থ উনি দিয়ে যাবেন। কত টাকা চাই সেটা যেন সবুজ গুহা ফোনে বলে দেয়।

ওদের বাড়ি বড় হলেও চাকুরে বলতে ঐ মেয়ে। মহিলা অনেক বয়স্ক। মেয়েটি একটি তালাচাবির দোকানে কাজ করে। মাইনে সেরকম কিছু নয়। টেনেটুনে চালায়। তাই সবুজ বলে ওঠে :: কারো তো ক্ষতি হয়নি, না আমার না আমার পোষ্য পশুদের। কাজেই অর্থ দাবী করা বাতুলতাই হবে। এত সুন্দর গাছটা ঝড়ে পড়ে গেলো- এতেই আমার খুব দুঃখ হয়েছে। আর এসব মনে করতে চাইনা। অন্য গাছ লাগিয়ে দেবো খন।



ভদ্রমহিলা নাছোড়বান্দা । টাকা না দিলে হয়ত লোকেরা মন্দ বলবে ।  
যে রেসিস্ট তাই এশিয়ানকে ঠকিয়ে দিলো । ইত্যাদি ।

তখন সবুজ গুহা বলে যে তুমি না হয় আমাকে এককাপ কফি বানিয়ে  
খাইয়ে দিও তাহলেই হবে ।

মিসেস কালাহান্ প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যান্ !

--তুমি এর জন্য কোনো টাকা নেবেনা ? সত্যি বলছো ? রিয়েলি ?  
চোখ জোড়া বিস্ময় ।

সবুজশাখা গুহা হেসে ওঠে !

এরপর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মিসেস কালাহান্ আর রোজের সাথে,  
সবুজকে কফি ও বিস্কুট খেতে যেতে হতো ।

**গাছ পড়েছে ; তারজন্য টাকা নেয়নি- না জানি কি মহৎ ব্যক্তি সে !**

সবুজশাখাও খুশি । গিম্মী দেশে ফিরে গেছে । কোনোদিনই বিদেশ  
ভালোলাগেনি । ইন্ডিয়াই নাকি ভালো ।

**সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ।**

তারপর থেকে লোনলিনেসে ভুগতো । নিজে দেশে ফিরবে না ।

ঐ ধূলো, ধোঁয়া , দুঃস্বপ্ন আর আদিকেকে চিকিৎসা ব্যবস্থা  
কোনোটাই ওর মনের মতন নয় । কাজেই এখানেই ভালো আছে

। বোনাস হিসেবে পেলো বিশেষ কফি ও বিস্কুট । মাঝেমাঝে  
হলদিরামের সিঙারা আর চানাচুরও কিনে আনে মহিলা ।

এশিয়ান দোকান থেকে । সবুজ শাখার জন্য ।

একদিন চীনাবাজার থেকে চিংড়ি মাছের পাকোড়া কিনে আনলো ।  
একদিন নারকেল নাড়ুর মতন খেতে বিস্কুট । একদিন ঝালমুড়ি -----  
!!!!

**ভালই আছে সবুজ শাখা গুহা -ভাগ্যিস্ লাল গাছটা ভেঙে পড়েছিলো !**



## রামধনু

মেয়ে বলে, শৈশবেই অনাথ আশ্রমে দিয়ে এসেছিলো পরীকে-- তার বাবা । পরপর অনেকগুলি মেয়ে হওয়ায় বিরক্ত ছিলো সে । পরে পরীকে অনাথ আশ্রম থেকে তুলে নিয়ে যায় এক অন্ধ মানুষ যে সম্পর্কে ছিলো পরীর দাদা । মাসির ছেলে ।

লোকটি খুবই সেন্সিটিভ । বোনকে নিয়ে আসে এবং তার স্ত্রী লেখা সেই মেয়েকে মানুষ করে । বয়সে অনেক ছোট এই বোনকে লোকে ওর কিড্‌ সিস্টার বলতো ।

**নীল চোখের মেয়ে পরী বা ফেরি** বড় হয়ে, বিয়ে করার শর্ত

হিসেবে বলে যে এমন কাউকে বিয়ে করবে যে মেয়েদের ঘৃণা করেনা । অনেক পুরুষ এলেও নানান কথায় বেরিয়ে পড়ে যে তারা কেউই আদতে মেয়েদের সম্মান করেনা । মেয়েরা দুর্বল , পুরুষের পদতলে থাকার যোগ্য এসব সোজাসুজি না বললেও ফেরি দেখতে পায় যে বেশিরভাগ পুরুষ এরকমই ভাবে ।

**কাজেই শেষমেশ সে বিয়ে করে এক রামধনু গাছকে ; Rainbow Eucalyptus --- !!**

রীতিমতন সেজে গুজে ওরা বিয়ে করে । লোকে নেমতন্ন খেতেও আসে । গাছটি , রামধনুর মতন বঙ্কল ঝারায় বলেই হয়ত লোকে ওকে দেখতে আসে । অর্থাৎ সে ইনকাম করে ।

বেকার নয় । কাজেই লোকে শুধালে পরী বলে :: **আমার বর মডেলিং করে । আর ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতেই অভ্যস্ত !**

## Information :: Rainbow Eucalyptus–The Most

### Colorful Tree on Earth

These trees may look like they've been painted on, but these colors are all natural. This peculiar tree is called Eucalyptus deglupta, commonly known as the Rainbow Eucalyptus, and also known as the Mindanao Gum, or the Rainbow Gum. The multi-coloured streaks on its trunk comes from patches of outer bark that are shed annually at different times, showing the bright-green inner bark. This then darkens and matures to give blue, purple, orange and then maroon tones.

Eucalyptus deglupta is the only Eucalyptus species found naturally in the Northern Hemisphere. It grows naturally in New Britain, New Guinea, Ceram, Sulawesi and Mindanao. Now, this tree is cultivated widely around the world, mainly for pulpwood used in making paper, and also for ornamental purposes.

<http://www.amusingplanet.com/2011/10/rainbow-eucalyptusthe-most-colorful.html>

## ফরহান্

সাধারণ মানুষের ফরহান্কে নিয়ে কোনো কৌতুহল না থাকলেও, মোহিতাকে সে মোহিত করেছে।

আসলে মোহিতা ভীষণ ব্যস্ত এক মানুষ। চাকরি থেকে ছুটি নেওয়া কিংবা খুচরো পয়সা নিয়ে চলাফেরা করা তার পক্ষে দুটো অসম্ভব। সে ক্রেডিট কার্ডে অভ্যস্ত। যেখানেই যায় সেখানেই কার্ড বার করে পেমেন্ট সারে। বেশির ভাগ জায়গায় এইরকম চললেও একবার একটি দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে বিপদে পড়ে। ওখানে অনেক দোকানে ক্রেডিট কার্ড নেয়না। ওরা এখনও প্রাচীন যুগেই বাস করছে। ঠিক

সেইসময়ই ওকে সাহায্য করে ফরহান্।

**টাক্ মাথা, গোলগাল চেহারার পাকিস্তানি মানুষ।**

লোকটি ব্যবসা করে। অচেনা ভারতীয় মেয়ে মোহিতাকে -সাহায্য করতে, ওর সমস্ত বিল শোধ করে দেয় মানুষটি।

মোহিতা অবাক হয়। ফরহান্ বলে ওঠে :: আমরা দুজনেই হিন্দি বলি আর প্রতিবেশী দেশ থেকে এখানে এসেছি। আমার অনেক ভারতীয় ক্লায়েন্ট ও বন্ধু আছে। উই আর ফ্রেন্ডস্ হিয়ার। উই ডেন্ট ফাইট হিয়ার। ভয় পেয়োনা, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না।

**মোহিতার এত বিল হয়ে গিয়েছিলো যে উপায়ও ছিলো না।**

তবুও বলে ওঠে :: তুমি তো আমাকে চেনো না, যদি আমি তোমার টাকা ফেরৎ না দিই?

ফরহান্ টাক্ মাথা চুলকে বলে ওঠে :: তাহলে ধরে নেবো যে আল্লাহ্, এই বান্দার কাছ থেকে এই অর্থ দাবী করছেন!

বলেই খুব জোরে হেসে ওঠে। আসলে মোহিতা প্রথমেই ওর চেহারা ও চলন বলন দেখে ওকে সন্দেহ করতে শুরু করে। পরে এই ধারণা বদলে যায়। অদেখা চিন্তা স্রোতের জন্য ভীষণ ভাবে লজ্জিত হয় - বিবেকের কাছে।

সত্যি, আজও পাকিস্তানের দিগন্তে **মরমী কাফিলা** দেখা যায়!



## গরম ভাত

গরম ভাত খেতে কার না ভালো লাগে ? তাও আবার ঘি ও আলুভাজা, বেগুনি দিয়ে ? সারাদিন পরে, ক্লান্ত দেহে যখন গরম ভাত ও নানান সুস্বাদু খাবার সামনে আসে তখন মানুষ হয়ত বা একটু বেশি খেয়ে ফেলে !

কিন্তু আমরা এমন এক মানুষের কথা শুনবো যে পাগলের মতন গরম ভাত খায় । খেয়ে উঠেই আবার খায় । আবার খায় , আবার----আবার !

**নাহ্ ! এ কোনো গ্রহান্তরের জীব নয় । একেবারে খাঁটি বাঙালী ।**

লোকটি দুর্দান্ত পিয়ানো বাজাতো । পিয়ানিস্ট । কম্পোজারও বটে । সবসময় বলতো :: একজন কম্পোজারের কাছে পিয়ানো হল গড় । একদিন এই মানুষটির প্রতিটি রিডের মূর্চ্ছনা, হৃদয়ে হিল্লোল তুলতো । কতনা ভেঙে পড়া , হারিয়ে যাওয়া , মুষড়ে পড়া , হেরে যাওয়া মানুষকে এই বাজনদার পথ দেখিয়েছে । তারা আবার ওর সঙ্গীতের জাদুস্পর্শে , জীবনে ফিরেছে । আবার স্বপ্নগুলো সাজিয়ে নিয়ে তরী ভাসিয়েছে , সমুদ্র জীবনে ।

এই মানুষটি আজ গোথ্রাসে গরম ভাত খায় । বারবার খায় । খেয়ে উঠেই আবার খায় । প্রায় সায়াহ্নে পৌঁছে যাওয়া এই মানুষটি সম্পর্কে

বিশেষজ্ঞরা বলে যে ওর সাইকোসিস্ হয় । অনবরত হচ্ছে । এরকম আর কিছুদিন চললে অর্থ থেকে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে ।

সারা দুনিয়া যখন ওর সঙ্গীতের জাদুস্পর্শ নিতে ব্যস্ত ঠিক তখনই দেখা যায় মানুষটি বারবার পিয়ানোর রিড্ মুছে পরিষ্কার করছে । আর মাঝেমাঝে গরম ভাত খাচ্ছে , খুবলে নিচ্ছে বলা ভালো ।

ওর নাকি মনে হয় যে গরম ভাত খেয়ে ওর পেট ভরছে না তাই আকাশ থেকে বিষ্ঠা বৃষ্টি হচ্ছে । আর পিয়ানোর সমস্ত রিড্ ঐ নোংরায় ডুবে যাচ্ছে ।

---ওভার সেন্সিটিভ্ হবার এই এক সমস্যা । জীবনের কষ্ট ও দুঃখ ইত্যাদি, সমস্ত কিছু উনি নিজ চেতনায় ধারণ করছেন , বুঝে অথবা না বুঝেই । সেই চাপ থেকে অবচেতন বিগড়েছে আর অবসেশান হয়ে উঠেছে পিয়ানোর রিড্ ।

আজও মিউজিক বাজছে তবে তা আর ম্যাজিক উৎপাদন করছে না বরং সমস্ত মন তার ভরে উঠেছে নোংরা , পতিত আবর্জনায় ।

ওরই ভক্ত এক নারী , যাকে চূড়ান্ত বিবাদের সময় এই কম্পোজার আলো দেখিয়েছিলো- তার সুচারু মিউজিক দিয়ে, সেই ব্যক্তি আজ দেখছে এই গীত প্রডিজির বিবাদময় করুণ অবস্থা ; যা থেকে থেকে আকাশ থেকে কেবল বিষ্ঠা- বৃষ্টি ঝরাচ্ছে ।

## রৌদ্রছায়ায়

হঠাৎ একদিন নিজের বাড়ির ভেতরে, এক সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করে জয় সরকার । বিদেশে এসে অনেক খেটেখুটে এই বাড়ি কিনেছিলো । কতনা আজব কাজ করতে হয়েছে তাকে !

টয়লেট সাফ্ করা , চিকেন কাটা , কবরখানার পাহারাদার ইত্যাদি । বাড়িটি অনেক পুরনো । যখন কিনতে যায় তখন এক ভদ্রমহিলা তার ব্যক্তিগত খবর দিতে শুরু করে । এজেন্ট বলে :: উনি খুব দুঃখ পেয়েছেন এটা বিক্রি করতে হচ্ছে বলে কিন্তু উপায় নেই । ওর মা খুব অসুস্থ আর তার বয়স ১০০ বছরের ওপরে । উনি ইউরোপে থাকেন । তার সেবা করার জন্য মালকিন্ ইউরোপে চলে যাবেন । তাই বাড়ি বেচে দিচ্ছেন ।

অতিরিক্ত পার্সোনাল জিনিস বললে জয় যেন কিছু মনে না করে । জয় তো ভারতীয় কাজেই ব্যক্তিগত আলাপ প্রলাপে ভালই অভ্যস্ত তাই ওর মন্দ লাগেনি মহিলার মানে মালকিনের কথাগুলো । **পরে তো গুপ্তধন পেলো !**

**১৫ মিলিয়ন তার মূল্য ; এখনকার বাজারে ।**

সং এই যুবকটি , সরকারকে এই অর্থ ফেরৎ দিতে চাওয়ায় , সরকার বাহাদুর খুশি হয়ে ওকে সাত মিলিয়ন দিয়ে দেন ।

কাজেই এখন জয় একজন ধনী মানুষ। দারিদ্র্য তার কাছে অতীত। সে এখন অনেক কিছুই করতে সক্ষম যা এই জন্মে আর পারবে বলে মনে হয়নি।

ভারতে ফিরে যায় জয়। সেখানে এক স্কুল খুলেছে যেখানে শৈশব থেকে মানুষের বাচ্চাদের -হরিণ ও রাজহাঁস করা হয়।

আর গাঢ় সন্ধ্যা নামলে জয়, নারীদের খনন করে।

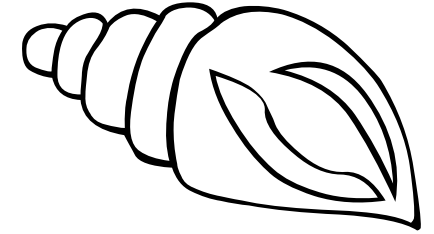
ওদের দৈহিক গভীরতা ও সৌন্দর্য্য নিয়ে গবেষণা করে। ওর প্যাশান হল নারীর বক্ষ সৌন্দর্য্য নিয়ে গবেষণা করা। মেয়েদের ব্রেস্টের ছবি ক্যামেরাবন্দী করে তারপর নিজের একটি প্রাইভেট ঘরে বসে, বড় স্ক্রিনে সেই ফটোগুলি ফুটিয়ে তোলে। বিভিন্ন মেয়ের রকমারি স্তনের চিত্র! ছাগ স্তন, ফোটা পদ্মের মতন স্তন আবার পানপাতার মতন স্তন।

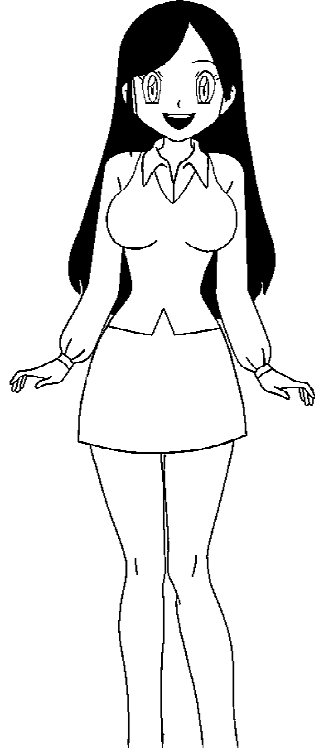
বিয়ে তো করেনি কোনোদিনই। কাজেই বাধা দেবারও কেউ নেই। নারী দিবস টিবস নিয়েও ওর কোনো কৌতুহল বা মাথাব্যথা নেই। কারণ নারীরা ওর কাছে অপ্সরার নামান্তর মাত্র। ওরা কেবল শয্যায় থাকবে। মাটিতে নামলে রেশমের কাপড়ে হাঁটবে। দ্বৈত জীবনে অভ্যস্ত জয় অনেক সময় মেয়েদেরকে নিজ চিন্তায় ধর্ষণ করে। তবে ওর সবসময় রূপসী মেয়ে চাই।

কুশীরী ওর দুনিয়ায় ঠাই পায়না।

কেউ প্রশ্ন করলে বলে :: আরে ভায়া, চাঁদেরও তো কলঙ্ক আছে। কোমল লতাদের, কমল রূপে পেতে চাওয়া-- এই ক্ষুদ্র অংশটা আমার জীবনে নামমাত্র কলঙ্ক। আমি মদ, গাঁজা, চরস্, সিগারেট কিছুই খাইনা। না ব্রথেকে যাই!

এরা সবাই আমার গার্লফ্রেন্ড। শুধু ইদানিং ওদের সংখ্যাটা একটু বেশি হয়ে গেছে। ক্রীড়া শেষে আমি সবাইকে একটা করে লেবুপাতার ওড়না প্রজেক্ট করি। সুগন্ধে ভরে ওঠে ওদের নির্মল মন।





## আন্দোলন

নানান আন্দোলনে দেশ ছাড়ে প্রগতি পান ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মগজ ধোলাই করেছিলো যেই ছাত্রছাত্রীরা, তারা এখন  
অনেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত । শুধু প্রগতির মতন কিছু বোকা যুবক  
যুবতী, পথভ্রষ্ট হয়ে জীবন কাটাচ্ছে ।

প্রগতি ফিজিক্স নিয়ে পড়তো । প্রিয় বিষয় ছিলো আলো । অপটিক্স ।  
পরে নানান গবেষণা করে একটি নকল সূর্য তৈরি করতে সক্ষম হয় ।  
যেই দেশে পালিয়ে এসেছিলো রাজনীতির খেলায় ,সেই দেশ একটি  
ক্ষুদ্র বরফে ঢাকা দেশ । এখানে খুব শীত পড়ে । বরফের প্রাসাদ আর  
মিউজিয়াম আছে ।

একটা সূর্য- তাও মাত্র দিনের কিছুটা সময় আলো দেয় ।  
দিনে, অনেক সময়ই আঁধার থাকে । কখনো কখনো গাঢ় অন্ধকারও ।

পাহাড়ে ঘেরা এই দেশ, যথেষ্ট রৌদ্র রং-এ ভাসেনা বলে লোকের দেহে  
নানান চর্মরোগ দেখা দেয় । লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ায় , এখানে  
কেউ বিজ্ঞানের গবেষণায় টাকা ঢালে না ।

প্রগতি পান ; জীবনের জলপান করে বুঝেছে যে সুযোগসন্ধানীরা চিরকালই থাকে শুধু তাদের জালে না ফাঁসলেই চলে যায় ।

আবার কিছু কিছু ঘটনা , জীবনে কেন ঘটে আর পরে কেন সেই নেগেটিভ ঘটনা থেকে পজিটিভ বার হয় সেটাও গবেষণার বিষয় । এই যেমন তার নিজের জীবন ! রিসার্চ করে নকল সূর্য বার করেছে ওরা যার প্রধান মাথাটা ওরই ।

এই সূর্য এখন সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় বসানো হবে আর ইচ্ছে অনুযায়ী অন্ আর অফ্ করা যাবে !

অতিরিক্ত বরফ আর শীতল বাতাসকে কাবু করতে সক্ষম এই নকল সূর্যের নাম সোলার ।

সোলারের চমক ও চমৎকারে হয়ত বাসিন্দাদের চর্মরোগও নির্মূল হয়ে যাবে ! কে জানে ?

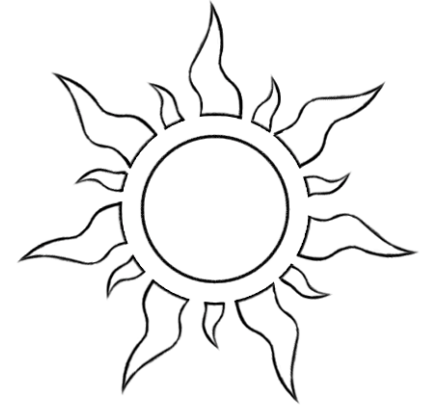
প্রগতির নাম, তার বাবা এমনথারা রেখেছিলো এইজন্য যে সে সমাজের প্রগতিতে অংশ নেবে । আন্দোলনে যখন নামলো তখন লেখাপড়া গোলায় গেলো । শেষে বাজে একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশান শেষ করে -তবে ফাস্ট ক্লাস পায় ।

পরে এই অতি শীতল দেশে এসে ঘাঁটি গেড়ে বসে । এখানে ঠান্ডার ভয়ে বেশির ভাগ দোকানপাট , অফিস , কাছারি সব মাটির নিচে । এমন কি অনেক বাসও মাটির নিচে দিয়েই যায় ।

আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি এখানে এসে টাঁকতে পারেনি । প্রগতি এখানেই আছে , বছরবছর । কারণ তার আর উপায় নেই । শালগম আর মাংসের চাঁই খেয়ে খেয়ে পেটে চরা পড়ে গেছে ।

এখন নকল সূর্যের কারণে হয়ত কিছু সতেজ সবজি ও ফলমূল পাবে ওরা , নিয়মিত । চাষবাস হবে পুরোদমে ।

আন্দোলনে সত্যি বুঝি প্রগতির জয়-বিজয় হয়েছে ।





## কবর

এই পরবাসে কেউ মারা গেলে তাকে সাধারণত: কবর দেওয়া হয় । তাই সবাইকেই নিজের কবরের জন্য জমি কিনে রাখতে হয় । যারা নিতান্তই গরীব তাদের অনেকের সমস্যা হয় ।

এরকমই এক মানুষ লিয়াম সেনশর্মা । স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে মনে দুঃখ বাড়ে । শেষে কোনো কাজেই উত্সাহ পেতেনা ।

দিনের পর দিন কাজ না করে করে বেকারত্বের কবলে পড়ে লিয়াম । শেষে বুদ্ধি বার করে । কবরখানায় ; প্রতিটি কবরের ওপরে ফুল দিয়ে যায় প্রিয়জন । এছাড়া রাস্তায় কারো দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে, পথপাশে ফলকেও পুষ্পস্তবক দেয় মানুষ । কেউ কেউ রোজ, কেউবা বছরের কয়েকদিন ।

এইসব ফুল সংগ্রহ করে লিয়াম, টাংস্টেন ক্রিক নামক নদীপাড়ে বসে বিক্রী করে ; অনেক কম দামে । এখানে পুষ্পস্তবকের খুব দাম । লিয়াম অনেক কম টাকায় দেয় তাই রোজকার স্টক রোজই ফুরিয়ে যায় ।

**এখন লিয়াম মোটামুটি স্বচ্ছল ! খুব শীঘ্রই নিজ কবর দেবার জন্য, জমি কিনবে বলে স্থির করেছে !**

## রিম্

ভারতে থাকতে খোল বাজাতো রিম্ গর্গ । উত্তর ভারতের মেয়ে, রিমের বাবা ছিলেন তবলাবাদক । ছেলেবেলা থেকেই মেয়েকে খোল বাজাতে শেখান । ভালো বাজনার হাত রিমের ।

মেয়ে খোল বাজিয়ে হিসেবে- অনেক জায়গায় নিজ শিল্পকলা প্রদর্শনের ডাক পেতো । এইভাবেই বড় বড় শহরে ঘোরা ।

অনেক বড় শহরে, সারাটা জীবনই কাটিয়েছে রিম্ গর্গ ।

কিন্তু ইদানিং বড় শহরকে ওর প্রাণহীন মনে হয় । যারা ওর বাজনার ভক্ত তাদের মধ্যে অনেকেই যেন প্রশংসা করার জন্য করে । অনেকে এরকমও বলে যে খোল বাজানো কারো পেশা হতে পারেনা । অনেক মানুষ মেকি হাসি দিয়ে সই চায় !

মনের শান্তির জন্য রিম্ আজকাল ছোট শহরে থাকে । সবাই সবাইকে চেনে । মুখের হাসি নির্মল এখানে , কড়ি দিয়ে কেনা নয় । রিমের হৃদয়ে মিঠে পরশ লাগে । অবশ্য খোল বাজানোর সেরকম ডাক আসেনা আর । এখানে লোকসংখ্যা অনেক কম । **কেবল সন্ধ্যায় রাধামাধবের মন্দিরে খোল বাজায় ।**

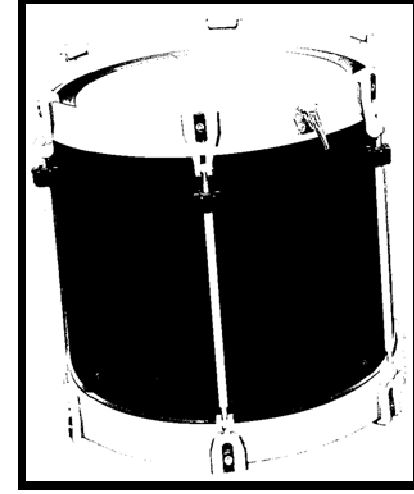
লোকে, হা করে চেয়ে থাকে । সুরেলা বাজনার অবসরে রিম্ একটি সেকেন্ড হ্যান্ড বইয়ের দোকানে কাজ করে । সেখানেই খোল সম্পর্কে অনেক তথ্য পড়েছে । কবে প্রথম খোল আবিষ্কার করা হয় , কতরকমের খোল হয় , আধুনিক খোল

কেমন ও তার নাম কী, ইন্ধনে কেমন ধরণের খোল ব্যবহৃত হয়, খোলের শব্দে বাতাস শুদ্ধ হয়। **কিছু নকল ব্রাহ্মণের কুক্ষিগত বেদের পরশ থেকে বাঁচতে কৃষকজনা শুরু হয় প্রবলভাবে।** সেখানে খোলের আওয়াজে যেন নেচে ওঠেন কৃষক কান্‌হাইয়া ও শ্রীরাম। সমাজের যে কোনো মানুষ এসে সেই আনন্দ লহরীতে ভাসতে পারে। জাতপাত নিয়ে কেউ প্রশ্ন করেনা। ভক্তিরসে মাতাল, এইসব উচ্ছল মানুষের বড় ভরসা **উত্তাল খোল!**

এতদিন রিম্ শুধু বাজাতেই জানতো। আজ থেকে সে খোল বিশারদ হয়ে উঠছে, প্রাচীন ও আধুনিক নানান পুঁথি পড়ে, এই ক্ষুদ্র জনপদ বা ছোট শহরের বাতিল বইয়ের দোকানে বসে। খোল কেবল পেশা নয় রীতিমতন নেশা হয়ে উঠছে তার!

জ্ঞানান্বিতে পুড়ে আবার নতুন রূপ নেবে রিম্ গর্গ।

সেই খোলের খোলসে, মানে টেরাকোটা ছালেই। রিম্ গর্গ, গর্গ থেকে হবে এবার গাগরি, হিরণ্য-গর্ভেই।



## স্বাতীলেখা

স্বাতীলেখাকে লোকে লেখা বলেই ডাকে । লেখা কৈশোর থেকেই খোলামেলা । স্বাধীনচেতা । প্রথম সন্তান যখন হয় তখন তার বয়স মাত্র ১৫ । ভালো করে হয়ত নারী শরীর তৈরিই হয়নি । ওর বয়স্ক্রেম শুভেন নিজেও তখন কিশোর ।

ভারতীয় সমাজে এই শিশুর ভবিষ্যৎ অনাথালয় ।

কাজেই সে সেখানেই মানুষ হতে শুরু করে ।

লেখার মা অবশ্য খুবই মুক্তমনা ছিলো । বলেছিলো :: মা হতে গেলে তোমার বিয়ে করার দরকার নেই ।

ওর মা দেদার সিগারেট খেতো আর নাটক করতো । বাবাও নাটক করতো তবে পরের দিকে শুধু চাকরি করতো টেলিফোন অফিসে । এই ভদ্রলোক এতই সৃষ্টিশীল ছিলো যে রোজ অফিস থেকে ফেরার সময় স্টেশানের ধারে ; এক পরিত্যক্ত মালগাড়ির কেবিনে বসে বসে অদেখা কোনো খালাসির হাতে গরমাগরম চা পান করতো । সেই চা-ওয়ালাকে কেবল লেখার বাবা হংসরাজই দেখতে পেতো । আর শুধু চা খেতো না গল্পও করতো ।

**অনেকে বলতো যে ঐ খালাসি নাকি হংসরাজের বিবেক !**

লেখার মা যুথী ; অত্যাধুনিক মহিলা হলেও সমাজের কথা ভেবে হয়ত বাচ্চটাকে ত্যাগ করতে পরামর্শ দেয় ! মাতৃত্বের স্বাদ তো পেয়ে গেছে লেখা, আর কি চাই ?

বেটার লাক্ নেক্সট টাইম !!

অনেক পরে স্বাতীলেখা, এক সরকারি অফিসারকে বিয়ে করে ।

ওরা নিঃসন্তান । সেই অফিসারের একমাত্র সহোদরা পিয়ালি পেশায় উকিল । যথাসময়ে পিয়ালি বিয়ে করে । কিন্তু ওরাও নিঃসন্তান । অবশেষে ওরা এক ছেলেকে দত্তক নেয় । ছেলেটিকে কেউ নিতো না । অনেক ক্লিয়েন্ট এলেও ওকে কেউ পছন্দ করতো না । কাজেই অনেক বয়স তার । প্রায় ১৬ বছর । পিয়ালি একটু ধান্দাবাজ । ভেবে দেখলো যে একেবারে শিশুকে আনলে তাকে মানুষ করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে । একটু বড় কাউকে আনলে সেই সমস্যা নেই ।

একটা বাচ্চাও থাকবে আর বেশি সময় তার জন্য খরচ করতে হবেনা । কাজেই এই কিশোরটিকেই কোলে তুলে নেয় ।

ছেলেটি দেখতে লেখার মতনই আর এসেছেও সেই আশ্রম থেকে যেখানে লেখার মা ও বাবা তাকে দিয়ে এসেছিলো ।

এখন সন্তানহীনা স্বাতীলেখা পূর্ণকুণ্ডের মতন ভরে উঠেছে ।  
রায়বাঘিনী , ননদিনীর পালিত পুত্রের স্পর্শেই ।

কেবল সবাই বলে : আশ্চর্য ঈশ্বরের লীলা ! একে দেখতে পুরো  
বৌদির মতন !



## সিঁড়ি

তিশি নামক এক জাতের তন্তু দিয়ে পোশাক বানায় অনেকে । এই তন্তু  
সহজে নষ্ট হয়না । কাজেই জামাকাপড় বছরদিন অবধি ভালো থাকে ।  
মধ্যবিত্তের বড় ভরসা এই তিশি ।

**হালুং গাছের ছাল দিয়ে এই তন্তু তৈরি হয় ।**

বিশেষ মেশিন ও মানুষের কেরামতিতে অনেক কারখানায় আজকাল  
এই ফাইবার বানানো হয় । ইস্ত্রির ঝামেলা নেই । ফাইন আবার  
মোটোও একইসাথে ।

**দামও কম থাকে, সহজলভ্য বলে ।**

এই তিশি প্রযুক্তি বিশারদ হানিফ কাজ করে নিচু পোস্টে । প্রায়  
অবসর নেবার সময় এসে গেছে কিন্তু হানিফের উঁচু পদে ওঠার কোনই  
সম্ভাবনা নেই ।

তার থেকে অনেক অনেক জুনিয়ার ছেলেপুলেরা, যারা হানিফকে  
কাকাও পর্যন্ত বলে থাকে তারা সবাই অনেক উঁচুতে উঠে গেছে ।  
হানিফ বিষাদে ভোগে । ভেতরটা শূন্য মনে হয় তার ।

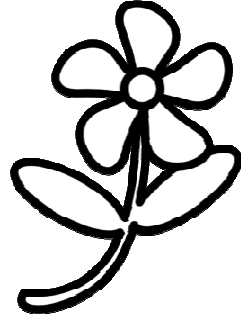
**লেখাপড়া করে যে, মোটরগাড়ি চড়ে সে এই বাণী আজকাল রসিকতা  
মনে হয় ।**

আসলে হানিফের গায়ের রং কালো । অন্যরা সবাই হলদেটে ও সোনালী । হয়ত তাই হানিফের কর্মক্ষেত্র এখন মেঘে ঢাকা তারা । তাই তিনি তন্তুর কার্যকলাপও ধীরগতিতে চলে ।

আর শুধু তাই নয় , এখানে হলদে ও সোনালী মানুষের সন্তানেরা বেশি নম্বর পায় , নানান ক্ষেত্রে চান্স পায় বেশি আর প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পায় ।

তবে এইসব মানুষের বরণ সোনালী ও হলদে হলেও তাদের মাথার ভেতরটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ । ডার্ক ম্যাটারের ভরা । উজ্জ্বল মস্তিস্কের হানিফ ; বাতিলের তালিকায় আছে বলেই বোধহয় কারখানা এক জায়গায় আটকে আছে । ব্যবসা স্রোতে জোয়ারের পরশ নেই , চারিদিকে কেবল ভাঁটা আর ভাঁটা ।

স্বরচিত এই মহাসমুদ্রে.....



## নীলাক্ষী

নীলাক্ষী অথবা নীলা মারা যাবার পরে ওর স্বামী পিটার খুব ভেঙে পড়ে । অকালে চলে গেলো নীলা !

একসাথে দুজনে কলেজে পড়েছে । চাকরিও একই অফিসে করেছে । একটা মেয়ে আছে ওদের । তার নাম মৈত্রেয়ী ।

ছোট্ট মৈত্রেয়ী এখন দাদু-দিদুর কাছে মানুষ হচ্ছে ।

নীলাক্ষীর বাবা ও মা খুব দরদী মানুষ । মায়াবী মানুষ ।

কাজেই নাতনিকে বুকে তুলে নিয়েছেন ।

পিটার এখন কাজের পরে, সারাটা সময় সেইসব জায়গায় ঘোরে না যেখানে ও আর নীলা বেড়াতে যেতো কিংবা খেতে যেতো । এখন পিটার ঘুরে বেড়ায় সমস্ত গ্রসারি স্টোরে ।

সবজি কেনাবেচা দেখে । কিছু কিছু কেনে । কিছু কিনে দান করে দেয় কোনো সংস্থায় । কারণ এইসব গ্রসারি শপে গেলেই ওর নীলার কথা ভীষণ মনে পড়ে । নীলা এইসব স্টোরে ঘুরে ঘুরে, নানান সবজি কিনে ওকে স্যালাড করে দিতো । স্বাস্থ্যের কারণে ওকে স্যালাড খেতে বলেছিলো ওদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান । যখন সময় পায় তখনই পিটার সোজা গ্রসারি স্টোরে ঢুকে পড়ে । শুরু হয় বিভিন্ন সবজি কেনা ।

সবজি চয়ন । দোকানি জানতে চায় বাড়িতে পার্টি আছে কিনা- ওর কেনার বহর দেখে । কেউ কেউ আবার আরো এক ধাপ এগিয়ে বলে :: এত ঘনঘন পার্টি দাও নাকি হে তুমি ? খুব রসিক তো বটে !

ওরা জানেনা যে গ্রসারি শপ্ পিটারের কাছে -একটা স্মৃতি মাখা বেদী । যেখানে শ্রুতপাথরের বদলে আছে মোম জোছনা ।

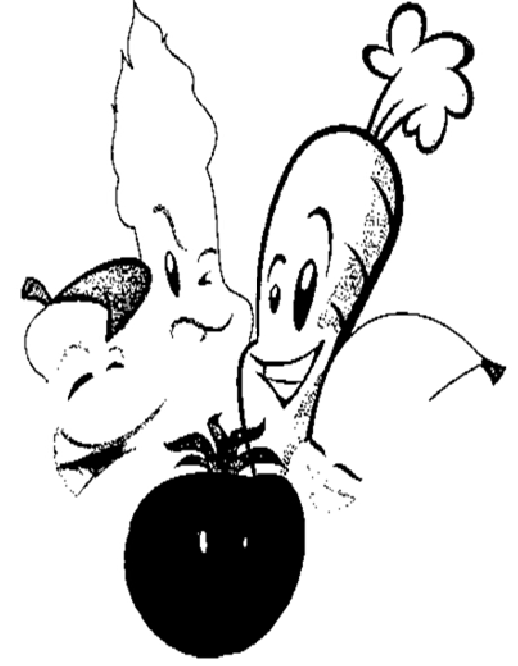
বিবাহ বার্ষিকী আর জন্মদিনে ও নীলাক্ষীকে সবজি খেতে দেয় । কেক কিংবা মিষ্টি নয় । আর বেলুনের বদলে ঝুলিয়ে দেয় লেটুস্ , পালং অথবা জুকিনির স্লাইস্ । কিংবা বক্ চয় , চাইনিজ ক্যাবেজ ও অ্যাস্পারাগাস্ ।

এসবই ; নীলাকে খুশি করবে ভেবে ।

কতনা গ্রসারি শপে ঘুরে, নীলা নানান স্যালাডের জিনিস সংগ্রহ করতো ওকে বানিয়ে দেবে বলে !

শুধু ওরই জন্য নানান ব্যস্ততার মাঝে বিভিন্ন শাকপাতা জুটিয়ে পুষ্টিকর খাবার বানাতো নীলাক্ষী ।

পিটারকে সবসময় টাটকা ও জীবন্ত দেখার জন্য ।



## জটা

প্রফেসর শশধর সান্যালের মাথায় বিশাল জটা। চুলগুলো লাল হয়ে গেছে। চ্যাটচ্যাটে চুলে কয়েকটা মাছিও বুঝি আটকে আছে! ভদ্রলোক ইংলিশ পড়ান। আগে একটি স্কুলে পড়াতেন আর এখন সিকিমের এক কলেজে পড়ান। কলেজের নামটা ভারি সুন্দর; রাঙামাটি। কোনো বাঙালী সমাজসেবক এই কলেজ তৈরি করেন -- হয়ত তাই এরকম মন ভোলানো নামখানি।

শশধরের স্ত্রীও আছে। জটাধারী এই শিক্ষকের প্রেমে, এই নারী কি করে মজলো তাই নিয়েও অনেক গল্পকথা বাজারে চালু আছে।

**শশধর, নিপাট ভালোমানুষ আর উচ্চ বংশজাত।**

বিদেশে বেড়াতে গিয়েছিলো কৈশোরে। নিজের দুই বোন কল্পিতা ও শিল্পিতার মাথায় স্কুল থেকে আনা ভয়ানক উকুন দেখে দেখে শশধর স্থির করে যে বড় হয়ে এমন কিছু করবে যাতে মেয়েদের এই সমস্যা থেকে মুক্ত করা যায়। বিদেশে বেড়াতে গিয়ে যখন চুল ছাঁটতে যায় তখন সেখানে দেখে যে *lice outbreak, lice infestation* যাই বলো না কেন তারজন্য এমন মানুষও আছে যারা মাথার প্রতিটি উকুন

বেছে তুলে দেবে। অনেক সময় নাকি এইসব উকুন মানুষের দেহেও ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই সাবধানতা অবলম্বন করাই শ্রেয়।

**এসব দেখে শুনে শশধর বা শর্টে শশী ঠিক করে যে বড় হয়ে সে উকুন বিশারদ হয়ে উঠবে।**

উচ্চবংশের সন্তান সে। বংশমর্যাদা রাখার দায়িত্ব তার অনেকটাই আছে তাই বাড়ির লোকেরা সম্মতি দেননা।

বিশেষ করে বাবা ও কাকারা ওর মাথা কামিয়ে ওকে কয়েক মাসের জন্য গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়, যাতে টাটকা বাতাসে ওর মতি ফেরে।

কোনো উপায় না দেখে শশী লেখাপড়ায় মন দেয়।

অনেক গবেষণা করে। ইংলিশে ডক্টরেট করে। প্রিয় বিষয় ছিলো পত্রসাহিত্য। মনের কথা খুলে বলার জন্য চিঠির বিকল্প কিছু নেই। চিঠিতে মানুষ নিজেকে মেলে ধরে।

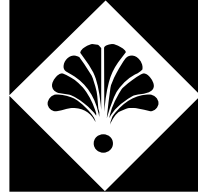
পরবর্তীকালে শশী বিদেশে গিয়ে আরো পড়াশোনা করে। একটি বই লেখে যার নাম দিঠি। চিঠি নিয়ে বই। বড় বড় লোকেদের চিঠি কতনা মিলিয়ন ডলারে নিলাম হয়! সেও এক সাহিত্য বটে!

মানবসমাজের সর্বশেষ ডিগ্রী যা অর্জন করা সম্ভব তা করে প্রথমে স্কুলে ও পড়ে কলেজে পড়াতে শুরু করে।

কিন্তু উকুন বিশারদ হবার বাসনা মেটেনি আর পরিবারের চাপের কাছে মাথা নত করেছে এই বিষয়গুলি মন:পীড়ার সৃষ্টি করতো। তাই মাথায় বিশাল জটা বানিয়ে বংশমর্যাদাকে কিঞ্চিৎ ক্ষীণ করতে উদ্যত হয়েছে। কেউ কিছু বলেনা কারণ আজ সে শিক্ষক। ডিগ্রীও অনেক আছে।

শুধু জটাটি যদি না হতো তাহলে ভালই হত কিন্তু সবকিছু তো একসাথে পাওয়া যায়না !

আর শশীও তার নির্মল চাঁদবদনের ওপরে এই তেলচিটে , লালচে , শক্ত ও বটগাছের ঝুরির মতন জটাখানি সাজিয়ে দিবি আছে । যেন পরিবারের লোকের মুখ সদাই কষে থাপ্পড় মারছে । মুখে অবশ্য বলে :: হয়ত কখনো এই জটাধারীকে দেখে আমার বাড়ির মানুষের মতি ফিরবে । কোনো বংশধরের ঘাড়ে, ওরা নিজেদের ইচ্ছের বোঝা চাপাবে না আর । মুক্ত বাতাসে পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচতে দেবে । জীবন ইটানাল কাজেই চয়েসও ইটানাল হোক ! নবকুঁড়িদের গুরুত্ব দেবে, তাদের ভালোবাসবে আর শ্রদ্ধাও করবে ; জীবন যাপনে নতুনত্ব আর চিন্তায় অত্যাধুনিক ধারা নিয়ে আসার জন্য ।





## বার্বিকিউ ও বনভোজন

মতিলাল পান অস্ট্রেলিয়ায় আছেন অনেকদিন। এখানেই বিয়ে-শাদি করেছেন। স্ত্রী গত হয়েছেন কয়েক বছর হল। ছেলেমেয়েরা যে যার নিজের জীবনে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে নাতিনাতিনিরা আসে, দাদুর কাছে। ওদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

অবসর সময় একাকীত্বে ভোগেন। দেশে ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই কারণ সেখানে আর কেউ নেই। যারা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ নেই।

দীর্ঘদিন ডাক বিভাগে কাজ করা মতিলাল যখন ওদের সিইও

হন তখন অনেক কাজ করেছেন। খ্রীস্টমাস ও ইস্টারের সময় নিজে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিঠি-চাপাটি বিলিও করেছেন। সেই সময় ডাকের চাপ থাকে আর কর্মী সংখ্যাও অনেক কম তাই।

যত বয়স বাড়ছে তত মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। আজকাল মনে হয় :: সব শেষ হয়ে গেলো বুঝি। ভেতরে একটা মহাশূন্যতা থাকে। স্ত্রী, এস্থারের মৃত্যুর পর আরো একা

লাগে। ছেলেমেয়েরা ওঁকে খুবই ভালোবাসে। ওরা বলে যে **মতিলালই সেরা পিতা ; দুনিয়ার।**

মতিলাল কোনোদিন পতীর সাথে ঝগড়া করেন নি। একমাত্র ফাইট হত যখন ছেলেমেয়েরা অবাধ্যতা করতো। ওদের কঠোর নিয়মের মধ্যে রেখে মানুষ করেছিলেন। তবে বন্ধুও ছিলেন। ওরা নিজেদের রিলেশানশিপ নিয়েও বাবার সাথে আলোচনা করতো, নানান মতামত নিতো।

**মতিও অত্যন্ত সাবলীলভাবে মতামত দিতেন।**

**-আমার মনে হয় তোমার ফ্লার্ট করাটা ঠিক হচ্ছে না, মেয়েটি সিরিয়াস্ অথবা তোমার বয়স্ফ্রেন্ডকে এখনই বিদায় না করলে বিপদে পড়বে ইত্যাদি।**



এহেন মতিলালের ইদানিং সময় কাটেনা । একা লাগে । চাকরি জীবনের কথা মনে পড়ে ।

**অস্ট্রেলিয়া ; বার্বিকিউ এর জন্য নামী ।** এখানকার বার্বিকিউ অতি উপাদেয় । তাই মতিলাল আজকাল পথের ধারে বার্বিকিউ করেন-- সপ্তাহের প্রথম তিনদিন ফ্রিতে দেন বাকি তিনদিন পয়সা নিয়ে বিক্রি করেন ।

রবিবার কাজ করেন না । সেদিন সারাদিন নদী কিংবা লেকে নিজের নৌকো নিয়ে ভেসে বেড়ান । সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের ছবি ক্যামেরাবন্দী করেন ।

প্রতিদিনের সূর্য না দেখলেও রবিবারের রবি- ওঁর মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয় । মেঘলা দিন হলেও সেদিন লেকে ভাসবেনই ।

জীবন ফুরায় না, নিজে ফুরিয়ে গেলেও । তাই বুঝি আবার ব্যস্ততায় ফেরেন মতিলাল । গোধূলির লাল আভা মেখে ।

মতিলালের সন্তানেরা সবাই ওঁকে নিয়ে মাঝে মাঝে বনভোজনে যায় । সেখানেও মতি বার্বিকিউ করেন ।

এক ব্যক্তি , তার নাম হরিয়ালি পান্ডা । পান্ডা ; মানুষের বাগানে চড়ে বেড়ানোর জন্য নিজের ছাগল ভাড়া দেয় । এই ছাগলেরা এসব বাগানে ঘুরে ঘাসপাতা খেয়ে নেয় তাতে করে বাগান সাফ করার ঝামেলা থাকেনা ।

আজকাল পান্ডা এসে মতিলালকে সাহায্য করে । মতির বাগানের জন্য সে নিজের ছাগলের পাল ভাড়া দেয় না । ফ্রিতে দেয় ।

সারাদিন পর, পশুরা বাড়ি ফেরে । আর পান্ডা তখন মতিলালের বার্বিকিউতে সাহায্য করে ঘরে ফেরে ।

**আস্তে আস্তে এই কর্মকাণ্ডও বেড়ে ওঠে ।**

পান্ডা একদিকে ছাগল আর অন্যদিকে বার্বিকিউ করে সময় কাটায় । পান্ডাই এখন বার্বিকিউ কান্ডের পান্ডা !

**মতিলাল এখন ছাগল চড়ায় , মোটা কড়ির বদলে ।**

**পান্ডা মাংস পোড়ায় । মতিলালের সন্তানেরা এসে ভক্ষণ করে ।**

পরে কখনো- ওরা সবাই মিলেমিশে ছাগলের মাংস কেটে, বার্বিকিউ করে , বনভোজন সারে ।

একটি সংস্থা, ক্যান্সারের মেটস্ ( ছড়িয়ে পড়া ) বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করছে । অনেকদূর এগিয়েছে রিসার্চ । ব্রেস্ট ক্যান্সার দিয়ে শুরু হচ্ছে- অন্যান্য **ডিএনএ** কেও কায়দা করা যাবে বলেই ধারণা , গবেষকদের । মতিলাল ওদের পলাশে , লাল আবীর যোগায় । **মতিলাল বৃদ্ধদের ক্লাবে যায়না, কর্মে ও যৌবনে বাঁচে । মতিলাল ওদের লাল লাল মাংস সরবারহ করে, ফ্রিতে ।**

Information ::: Barbeques Galore is joining forces with cancer charity **Cure Cancer Australia** for **BARBECURE** - an initiative that invites Australians to turn their next healthy barbeque into a **BARBECURE** to help raise funds for Cure Cancer Australia, a charity dedicated to funding early-career cancer researchers and enabling critical research grants.



## ঝাড়বাতি

মোমশিখা বিদেশে এসেছে প্রায় ১৫ বছর ।

এখানে সে পুলিশ বিভাগে, শিল্পী হিসেবে কাজ করে ।

ভেনিসে, আর্ট নিয়ে পড়ে অন্য দেশে এসে থিতু হয়েছে । এই দেশে মাফিয়া রাজ চলে । সমান্তরাল সরকার চালায় মাফিয়ারা । দেশের নাম মালং । সম্প্রাতিক মাফিয়া রাজার নাম লুকিনো ।

এই মানুষটি পিসের নামে ভায়োলেন্স করে । অসংখ্য মানুষ মেরেছে মানে পিস করেছে ওর বিশেষ পিস মানে শাস্তি আনতে গিয়ে ।

লোকটি এখন মৃত্যুদণ্ড পেয়ে জেলে বন্দী ।

ছদ্মবেশ ধারণে অসম্ভব পটু এই মানুষটি কোনোদিন আইনের হাতে ধরা পড়েনি । এই যে এখন মৃত্যুর অপেক্ষায় জেলে আছে সেও স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে । চার চারটে দেশের পুলিশ পেছনে লেগে থেকেও কোনোদিন ধরতে সক্ষম হয়নি ।

শেষে নিজেই সারেন্ডার করে ।

লুকিনোর লুকানো অবয়ব এখন লোকসমক্ষে । প্রায় সাত ফিট লম্বা । চওড়া বুকের ছাতি । তাম্রবর্ণ । কালো চুল । অনেকটা রাহুল দেবের মতন দেখতে । বলিউডের ভিলেন । তুবড়ানো গাল , ঈষৎ ঝোলা মুখশ্রী ।

প্রথম দর্শনেই মোমশিখা বোম্ব আউট ।

এতবড় একজন দাগী আসামী কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই ।

অবসর এখন অফুরন্ত তাই ওর সেলের দেওয়াল চিত্রাংকিত ।

বিভিন্ন মানুষের মুখ ও আকৃতি ।

সেই সুত্রেই মোমশিখা যাকে লোকে মোমো বলে ডাকে , একদিন ওর সেলে ঢুকে পড়ে । স্বপ্ন আলাপেই একেবারে অপরিচিত মানুষকে অতি আপন করে নিতে পারে ।

আর বিশ্বসংসার সম্পর্কে মানুষটির অসম্ভব জ্ঞান । বলেঃঃ দুর্বলদের সবসময়ই অত্যাচারিত হতে হয় । নিজের ভাগ নিজেকেই ছিনিয়ে নিতে হয় নাহলে অন্যরা পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাবে । সবাই মনোবাসনা পূরণের জন্য এই জগতে আসে । কেউ সফল হয় কেউ হয়না । নিজের পাওনাগড়া নিজেকেই বুঝে নিতে হবে । কেউ হাতে তুলে দেবেনা ।

এরকম একটি ব্রিলিয়ান্ট মিলিটারি মাইন্ড কী করে কুপথে চলে গেলো তাই নিয়ে ভাবার জন্য অন্য লোকেরা আছে । মোমশিখার

মনে হয়েছে যে এর সন্তান সে গর্ভে ধারণ করে একটি সং ও ব্রিলিয়ান্ট মিলিটারি মাইন্ড তৈরি করবে।

জেলের অফিসারগণ মোমশিখাকে খুবই শ্রদ্ধাভক্তি করে। স্কেচে অসম্ভব পারদর্শিনী এই বাঙালী মেয়েটি ওদের সবার চোখের মণি। কাজেই বলা হল যে কয়েদী রাজি হলে এই কর্মটি সম্ভব। আর রাজি হলও লুকিনো। আটের মিল আছে দুজনের মাঝে। জেলের সেলেই হল প্রথম ও শেষ মিলন, এক দুর্ধর্য ক্রিমিন্যাল ও নরম সরম বাঙালী শিল্পী মোমশিখা দত্তের।

পুলিশের নির্দেশে অচেনা মানুষের মুখ এঁকে, তাকে গ্রেফতার করতে সাহায্য করা মোমো এখন সেরকম এক মানুষের সাথে ফুলশয্যা পেতেছে।

এতবড় কয়েদী, সাইজে ও কর্মে- কিন্তু একটা শর্ত দিয়েছিলো যে মেয়েটি যেন কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন না করে।

**করেনি মোমশিখা। স্বপ্ন সবার সফল হয়না। যখন হয় তখন অল্প স্বল্প কম্প্রোমাইজ করতে ক্ষতি কী?**

যেদিন মানুষটিকে চির-ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হল সেদিন নিজের অজান্তেই মোমোর নয়নতারা, বৃষ্টিতে ভিজে যায়। **সেই বৃষ্টির**

**ছোঁয়া লাগে গর্ভে।** একদিন সে আসে। পুওর মিসগাইডেড জিনিয়াসের, জিনিয়াস চিহ্ন! **MIRKO : "the peaceful one".**

বিদেশী স্কুলে না পড়িয়ে; মোমো তাকে নিয়ে যায় সুদূর ভারতের একটি স্কুলে। যেখানে মানুষ তৈরি করা হয়, মেশিন নয়।

জিডু কৃষ্ণমূর্তির, ঋষি ভ্যালি স্কুলে পড়ছে ওদের ছেলে মিকো। **ওর, মানুষের ভালো করার ইচ্ছেকে-** ওর মা ও স্কুল শিক্ষা ওর দায়িত্ব বলে শেখাচ্ছে। **ওর বাবার মতন ফ্যানাটিক কিংবা অবসেসিভ না করে।**

বন্ধুরা যখন জানতে চায় এই পুলিশকর্মীর কাছে যে মোমশিখার সন্তান ঝাড়বাতি হবার দিকে পা দিয়েছে তবুও তার জীবনে আর কী কী ইচ্ছে বাকি আছে, তখন অত্যন্ত নমন্যভাবে মোমো বলে থাকে যে ওর ইচ্ছে ছিলো **মিসেস লুকিনো** হয়ে, বাঙালী নববধূর সঙ্গে সজ্জিত হবে, আলতা, সিঁদুর ইত্যাদি পরে - **মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছে ছিলো সধবার বেশে কিন্তু সেই সাথ আর কোনোদিনই পূর্ণ হবেনা।**



## কেউ

মেলবোর্নের সমুদ্রপাড়ে, একাকিনী এক ভারতীয় মহিলা। তার নাম লীনা কাপুর। বিদেশী সবজি সংস্থায় অনেকদিন কাজ করেছে। পরে স্বামীর সাথে একটি ছোট ফার্ম কিনে, সেখানে চাষাবাস করতো।

অর্গানিক সবজি চাষ হত সেখানে। সেই ফার্মের পেছনে একটি নদী ছিলো। নদীর সরু অংশ ক্ষেতের ভেতরে চলে আসে। দুই ছেলে সেখানে বসে বসে প্রায়ই মাছ ধরতো। শিশু দুটির শখ হয়ে দাঁড়ায়- **নিয়মিত মাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে খাওয়া।**

একদিন যীশু-অর্চনার সময়; একজন তলিয়ে যায় নদীর জলে। দু-তিনদিন ধরে তাকে না পাওয়া গেলে সবাই মিলে পুরো ফার্ম চষে ফেলে। শেষকালে ওকে নদীতে পচা গলা অবস্থায় পাওয়া যায়।

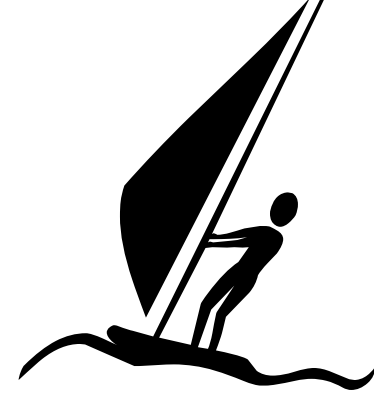
ওর মা, লীনাকে- কেউ এই সংবাদ দিতে না পেরে বলে যে ওকে পাওয়া যায়নি। ওরা গলস্ত দেহটি নিয়ে, মায়ের অজান্তে সংকার করে আসে।

লীনার স্বামী করণ ; ওদের ফার্ম বিক্রি করে দেয় । কিছুটা এই দুর্ঘটনার জন্য , কিছুটা স্মৃতির কারণে ।

ওরা এখন এক সমুদ্রপাড়ে বসবাস করে । ঢেউয়ের গর্জন নাকি ওদের ভালো লাগে । নীরবতা অসহ্য লাগে ।

ওদের বাড়ি, মোটা মোটা লোহার শিক্ দিয়ে ঘেরা । গেটে সর্বদাই তালা মারা থাকে । অন্য শিশুটিকে দেখাশোনা করার জন্য আয়া আছে । কারণ ওর মা লীনা, সকাল থেকে গভীর রাত অবধি সমুদ্র কিনারায় বসে থাকে ।

ভূগোলে পড়েছিলো যে নদী গিয়ে মেশে সমুদ্রে আর সমুদ্র সবকিছু ফিরিয়ে দেয় । তাই ছেলের ফিরে আসার আশায় দিন গুনছে । যদি নদীতে ডুবে গিয়ে থাকে তাহলে হয়ত নদী থেকে সে সমুদ্র হয়ে একদিন তার শূন্য কোলে ফিরে আসবে !



## চাকু

সুকুমার মানুষ হয়েছে এক আশাহরে । সেই শহরে আগে নবাব বংশ ছিলো । সুকুমারের বাবা নবকুমার- চাকু, ছুরির ব্যবসা করতো । ভদ্রলোকের দোকানে নানান নবাবী চাকুর দেখা মিলতো । মণিমুক্তা , পান্নাচুণী খচিত সেইসব ছুরির ইতিহাস ও ধার দুটো মনকাড়ার মতন । কিছু ছুরি ছিলো যা দিয়ে মানুষ খুন করা হয়েছিলো ।

অনেক ধনী মানুষ ও অন্যান্যরা ছুরি কিনে নিয়ে যেতো ।

নবকুমার বলতো :: নিজে রক্ষা করার জন্য সবসময় একটা চাকু সাথে রাখা উচিত !

**নেপালী কুকুর নিয়ে ঘুরতো সে ।** সুকুমারের পরিবারের সবাই একটা করে চাকু নিয়ে ঘুরতো । বিয়ের পরে ওর স্ত্রী প্রীতিলতাকে বললো : চাকু বেছে নাও ! লতাপাতারা বাইরের জগতে খুবই সফট্ টার্গেট !

প্রীতিলতা কিন্তু চুপ করে থাকে ।

কিছুকাল পরে ; এক ভ্রষ্ট পথচারী ওকে রেপ করতে উদ্যত হলে ভীষণভাবে জখম হয় লতার হাতে ।

লতা- ওর দেহের বিশেষ বিশেষ সফট্ অংশে, নানান রণকৌশলে মেরে - ঘায়েল করেছিলো ।

--ইচ্ছে করলে মেরেও ফেলতে পারতাম কিন্তু আইন নিজ হাতে নিতে চাইনা ।

কুস্তিগীর বাবার কাছে শেখা । বিপদে পড়লে মেয়েরা যাতে লতার মতন নুইয়ে না পড়ে তার জন্য এইসব শিক্ষাদান । লতা শব্দটা ওদের অস্বস্তিতে ফেলেনা মোটেই ।

চোখ খুবলে নেওয়া , গলায় কিল মেরে শ্বাস নালি ভেঙে দেওয়া ইত্যাদি প্রীতিলতা ও তার অন্যান্য বোন আইভিলতা , মাধবীলতা আর বনলতার কাছে ছেলেখেলা ।

**কথায় বলে, নামে কী আসে যায় ?**

দেখা যাচ্ছে লোকমুখে ফেরা এই বচন- বাস্তবেও দাগ কাটছে ।  
**লতা পরিণত হচ্ছে লৌহ-লতা বা শৃঙ্খলে ! মূর্খ রেসিস্টের হাতে ।**



## মুখা

কাঠগোলাপ ঝরে পড়ছে ফুলগাছ থেকে । একটাই বড় গাছ  
গেটের পাশে । আর আছে বেগুনি ফুলের ঝাড় ।

এই হাসপাতালের রেস্টোরাঁ- মুখা রঙ্গরাজের ভ্রমণের জায়গা ।  
নাহ্ ! মেডিক্যাল টুরিজম্ নয় এখানে খাবার খেতে আসে মুখা  
। চিররপ্তা এই নারীর বয়স এখন মধ্য চল্লিশ ।

জরায়ু বাদ গিয়েছে অসুখের আঁচড়ে । নেই ডিম্বাশয় কিংবা  
গর্ভনালী । শুধু দেহটি মেয়েদের মতন ওর ।

**তবুও বুকে উথাল পাতাল রোমান্স আছে ।**

ওর স্বামী ওকে ফ্লেপায় :: তোমার সব রোমান্স এখন কেবল  
আমার জন্য বুক্‌ড্ । আর চিটিং এর ভয় করিনা কারণ  
তোমাকে আর কেউ নেবেনা ।

**মুখা এই হাসপাতালে এক সার্জনের জন্য আসে । ভদ্রলোকের  
বয়স জেনেছে সন্তরের ওপর । এখনও অপারেশান করেন এবং  
নিশ্চুত । কথা কম কাজ বেশি --করেন । অবিবাহিত ।**

মালয়লি মানুষ । চোখে পুরু চশমা । ফ্রেঞ্চকট দাঁড়ি - মেটে রং  
এর মানুষ । গলার স্বর বাজের মতন ।

যখন মুখ খোলেন তখন জ্ঞান আর বাজ একই সঙ্গে পড়ে ।

আগে দেখেছিলো যে এই ভদ্রলোক হাসপাতালের গার্বের্জ বিন  
সাব্য করছেন । দেখে ভেবেছিলো যে নিচুতলার কর্মী ।

পরে একদিন দেখে যে লোকটি চিকিৎসকদের জন্য রাখা কফি  
মেশিন থেকে কফি বানিয়ে ওদেরই কাপে কফি পান করছে ।

একটু বিরক্তই হয় মুখা , লোকটির স্পর্ধা দেখে ।

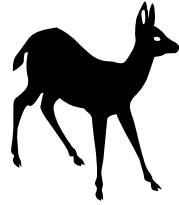
দেরিতে হলেও জানতে পারে যে উনিই ওদের সার্জারি বিভাগের  
চেয়ার ও হেড ।

**মুখা, মুখ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এখন । যখন বৃষ্টি নামে তখন  
বুঝি মাটির সোঁদা গন্ধে ঠিক এমনটাই হয় ।**

বন্ধুরা ওকে পাগলিনী বলে । ও কড়া গলায় জবাব দেয় ::  
শ্রীরাধিকা আর কৃষ্ণের কোনোদিন বিয়ে হয়েছিলো ? তাতে কি  
ওদের প্রেমে শুধু মরুতাপ ছিলো ? মরীচিকা মনে হলেও তাতে  
যথেষ্ট সজীব জলরেখা ছিলো , ছিলো কোমল উষ্ণতা ।  
রোমান্টিক স্পন্দন ।

মুক্ততা অন্যদিকেও ; তাই তো প্রতিদিন সায়াহ্নে, কাজ থেকে ফেরার পথে এই হাসপাতালের প্যাট্রিতে খেয়ে যায় । স্বামী ভাবে চিররঞ্জা স্ত্রী হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর ডায়েট খেয়ে সুস্থ হতে ইচ্ছুক ।

সন্ধ্যা গাঢ় হলে ; ছায়া গ্রাস করে রুম নম্বর সিন্ধু সিন্ধু ওয়ান ।  
এক বৃদ্ধ , ঘরের সমস্ত বাতি নিভিয়ে দিয়ে বসে থাকেন ।  
প্যাট্রির দিকে মুখ করে !



## ভালোমানুষের পো

মমতা ঘোষের, মায়া মমতার কোনো অভাব নেই ।

বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান হলেও সে হিংসুটে নয় । শৈশব থেকেই রাস্তার কুকুরকে খাবার দেওয়া , পাখিদের দানাপানি খাওয়ানো ইত্যাদিতে সে অভ্যস্ত ।

এখন বিদেশে থাকে । দেশের নাম ওলিম্ ।

এখানে সে এসেছিলো বটানি নিয়ে পড়তে । গবেষণা হয়ে গেলেও উপযুক্ত চাকরি না পাওয়ায় সে বড় বড় শপিং মলে ঘুরে ঘুরে, দোকান থেকে ওদের গার্বের্জ ব্যাগ নিয়ে বড় একটা গার্বের্জ বিন থাকে শহরের একদিকে , সেখানে ফেলে দিয়ে আসতো । বদলে পয়সা পেতো ভালই । একার চলে যেতো ।

এই ছোট্ট শহরে সবুজ মানে গ্রীন ময়লা নেবার জন্য কেউ আসেনা । সপ্তাহে দুবার মাত্র শপিং মলের বিন পরিষ্কার করতে লোক আসে গাড়ি নিয়ে তাই মমতার মমতাময়ী ভাব অর্থাৎ রোজকার ময়লা রোজ তুলে নিয়ে যাওয়াতে দোকানদারেরা বিশেষ করে ক্যাফের মালিকেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো ।

ড: মমতা ঘোষ সাতদিনই কাজ করতো । অন্যসময় ওর ল্যান্ডলেডির সাথে গল্প করে কাটাতো ।

ওদের পড়শী মহিলার বয়স প্রায় নব্বই-একশো । সন্তানেরা যথেষ্ট বয়স্ক । দেখার কেউ নেই । খ্রিস্টমাসে কেউ খবর নেওয়া দূরে থাকুক একটি কার্ড দেওয়া বা ফোন করা সেটাও করেনা ।

**মহিলা একা একা সারাটা দিন বাইরে বসে বকবক করে ।**

**শাপ-শাপান্ত আর বাপ্ বাপান্ত করে সবাইকে ।**

মমতাকে ডার্টি গার্ল বলে ডাকে । কারণ সে সাফাই এর কাজ করে এখন । আগেও বটানির গুঁতো খেয়ে বনেবাদারে যেতে হত । **মজার ব্যাপার হল ও যেই সাবার্বে থাকে তার নামও বটানি ।**

একদিন হঠাৎ শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা গেলো পড়শী, মিসেস ট্যাগোরে । হ্যাঁ , রবীন্দ্রনাথ টেগোর নয় লুডা ট্যাগোরে ।

পরে জানা গেলো- মিসেস ট্যাগোরে তার বিশাল বাগান ও বারান্দা সমেৎ পুরো বাড়িটা, মমতাকে দান করে দিয়ে গেছেন কারণ ওর মনে হয়েছে- যেই মেয়ে ওদের দেশকে সাফ রাখতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে সেই মেয়েই একমাত্র পারবে তার অবর্তমানে ওর স্বামীর তৈরি এই শখের বাগিচা ও মহল ; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে রাখতে । **ওর অপোগন্ড সন্তানেরা, যারা কেবল মানি মানি মানি করে** আর নাতিনাতিনিরা- এই বাড়ি পাবার যোগ্য নয় একেবারেই ।

## পেস্ট কন্ট্রোল

বিদেশে আসার সময় পোষা কুকুর ডিজেলকে একটি কেনেলে দিয়ে এসেছিলো বরখা আর সমীরণ সিংহ ।

পোষা জিনিস দূরে চলে গেলে অসম্ভব কষ্ট হয় । ওরা তো নিজেদের বাচ্চার মতনই !

অনেকদিন বরখার বুকে যন্ত্রণা হত । নিজের একটা বাচ্চা চলে গেলে যেমন লাগে ঠিক সেরকমই কষ্ট হত ।

সমীরণের বুকে মুখ দিয়ে কত কেঁদেছে !

সমীরণ ওকে বলেছে যে কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হয় । তবুও মন মানেনি ।

ছোট্ট জীবটির বুকে কষ্টো কষ্ট হয়েছে ওরা বুঝেছিলো । ওর চোখ থেকে জল পড়ছিলো । ও চীৎকার করে কাঁদছিলো ।

**বরখাও চোঁচিয়ে উঠেছে , হি নিউ ইট , নিউ ইট !!**

ইদানিং বরখার বাড়িতে পোকামাকড়ের উপদ্রব শুরু হয়েছে । গরমকালে বেশি হয় । শীতকালে প্রায় দেখাই যায়না ওদের !

প্রতিদিন কাজ থেকে ফিরে একটা না একটা কিছু মরে পড়ে থাকতে দেখতো। ভাবতো নিজে থেকে মরে গেছে। ফ্রিকুয়েন্সি বেশি হলে ভাবতো যে কোনো রহস্যজনক কারণে মরে যাচ্ছে।

পরে দেখলো যে বিছে, সাপ এমনকি বড় বড় ইঁদুরও মরে পড়ে থাকছে।

একদিন ডিজেলের প্রিয় ইলিশ মাছের কাঁটা, বিনের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো। সেই বিনে অসম্ভব আওয়াজ শুরু হয় যেন কেউ টেনে হিঁচড়ে ওগুলি বার করছে। কিন্তু কোনো কাঁটা কিংবা মাছের টুকরো পড়ে নেই।

একদিন কেন, কয়েকদিন পরপর- সন্ধ্যাবেলা কার যেন ছায়া দরজার পাশ থেকে সরে গেলো। সাদা মতন কিছু একটা, একটু কুয়াশার মতন আর কালো দুটি টানা টানা উজ্জ্বল চোখ।

একবার রাস্তায় খুব কুয়াশা ছিলো। গাড়ি চালানোতে সমস্যা হচ্ছিলো। ফগ লাইট ফাইটে কোনো সুবিধে হচ্ছিলো না।

তখন ওরা দেখলো যেন কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এলো এক সাদা ধোঁয়া। একটি আকৃতি নিয়ে ছুটে চললো রাস্তার মাঝখান দিয়ে। ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটি পশুর মতন ছোট্ট চেননা!

ওদের প্রিয় কুকুর ডিজেল -সাদা বা রূপার মতন চকচকে লোমওয়ালা, তাজা এক জাপানী স্পিঞ্জ ছিলো। যে খেলতো আর নানানভাবে পোজ দিতে পছন্দ করতো।

*লেখিকার ব্যাক্তিগত জীবনের ঘটনা।*



## ইনকাম্ ট্যাক্স অফিসার

**ঘুষ নিয়ে নিয়ে ধনী হওয়া অফিসার ;** ঘুষব্রত ঘোষ এখন বিদেশে থিতু হয়েছে ।

আসলে হঠাৎ একদিন ওর বাসায় রেড্ হয় । প্রচুর ধনসম্পদ মেলে ওর দেওয়ালের লুকানো কুঠুরি থেকে । কোর্টে ওকে বলা হয় যে এত অর্থ যা ওর আয়ের সাথে ম্যাচ করেনা সেই অর্থ সে কোথায় পেলো ? **ঘুষব্রত চুপ করেই থাকে ।**

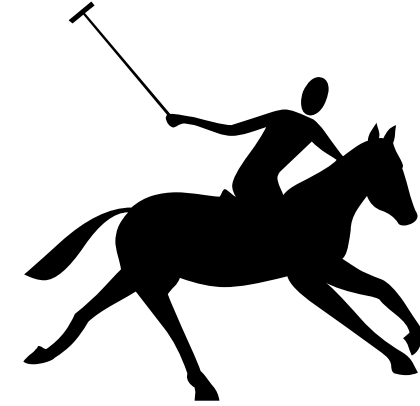
আইনের মানুষ, জনসাধারণের হিতে বলেন ::: যদি মেনে নাও যে এগুলি তোমার স্ত্রী আর তুমি পর্ণগ্রাফি চালিয়ে/দেখিয়ে পেয়েছো তাহলে একটা লজিক পাওয়া যাবে, আয়ের এই আজব পরিমানের । তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে ।

লজ্জার মাথা খেয়ে ঘুষব্রত স্বীকার করে নেয় যে এই অর্থ তার কাছে হার্ড ও সফট্ পর্ণো করেই এসেছে ।

কোর্টের রায় বেরোনোর পরে লোকে ছিঃ ছিঃ করলেও ওর স্ত্রী অসম্ভব চটে যায়, এই মিথ্যে বোঝা তার স্কন্ধে চাপানোর জন্য । **তবে মগজ বটে ঘুষব্রত ঘোষের ।**

সমস্ত টাকা নিয়ে চলে আসে বিদেশে । এখানে নবজীবন শুরু করে । এই দেশে বেশ্যাবৃত্তি লিগাল । কাজেই ওর কোনই সমস্যা হয়নি । স্কু বা ডাইভিং আর বাজ্জি জাম্পিং করে দিন কাটায় ।

**বহাল তব্বিতে আছে উপস্থিত ও বাস্তব বুদ্ধির জোরে ।**



## ভ্রমণ

সম্প্রতি বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ঘুরে গেছে আলিয়া খাতুন।

পরবাসে জন্ম ও বড় হওয়া। যুবতী হলে; নিজ দেশে ঘুরে যায়।  
বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে যেন খুঁজে পেয়েছে  
নিজেকে। প্রবাসে কত সুখে আছে ওরা!

এশিয়ায় জল, স্থল আর অন্যান্য বেসিক জিনিস নিয়ে মারমার  
কাটকাট। এক শহরে, খোলা তরবারি নিয়ে আলা হো আকবর  
স্লোগান দিতে দিতে ছুটে যাচ্ছে কিছু পথভ্রষ্ট মানুষ।

ফিরে এসে বসের বকা শুনেও মিষ্টি হাসে। ফাস্ট ফুড জয়েন্টে  
গিয়ে অর্ডার দিলে, ওরা যদি ভুল করে তিনটে চিজের বদলে  
দুটো দিয়ে দেয় কিংবা বার্গারে একটো স্পিনিচ ও মাশরুমের  
বদলে টমেটো ও লেটুস্ দিয়ে দেয়, আলিয়া একেবারে রাগে না।  
বরং মৃদু হেসে সাহেবি কায়দায় বলে ওঠে :: নো ওয়ারিজ্।

প্রবাসে সত্যি ওরা কত সুখে আছে !!

## বুলেট প্রফ

বিশুসুন্দরী ও লোকপ্রিয় নায়িকাদের যারা স্টকার্ তাাদের  
শায়েস্তা করার এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছেন  
মিস্টার ফাউন্ট ব্রেডি।

সত্যি বেশ ব্রেভ উনি। এমন এক যন্ত্র উনি বার করেছেন যার  
বোতাম টিপে দিলেই নিজে থেকে রূপসী মেয়েরা নকল পুরুষাঙ্গ  
বার করে পুরুষ হয়ে যাবে আর ওদের স্তন তখন বিভাজিকার  
শোভা না বৃদ্ধি করে চেস্ট ওয়ালে ঢুকে পড়বে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি !!

কিন্তু ঘটনা হল এই যে বেশিরভাগ রূপসীই এই যন্ত্রের বিরুদ্ধে।  
কারণ তারা স্টকিং পছন্দ করে। ওদের জন্য কতনা মানুষের  
হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। ওরা মারা গেলে লোকে আত্মহত্যা করে  
। ওদের নকল করে চুল কাটে। স্নো পাওডার মাখে।

কাজে কাজেই পাপারাঞ্জির মতন স্টকারদেরও স্বাগত জানায়  
কোনো বাহ্যবিচার না করেই। আসলে ওরা প্যাম্পারড্ আর  
প্যাপড্ হতেই চায়।

(Note—Papped -- informal): take a photograph of a  
celebrity without permission, get photographed by  
paparazzi)

## শিশু

অত্যন্ত সাহসী সেনা অফিসার- যিনি একাই অরুণাচলের সীমান্তে  
চীনা সৈনিকদের অত্যাচার বন্ধ করেছেন তিনি ছুটিতে গ্রামে  
এসেছেন ।

চৈনিক সৈনিকরা ; বর্ডার পার করে ঢুকে প্যাগোডার বুদ্ধ মূর্তি  
ভেঙে দিচ্ছে , মেয়েদের ধরে নিয়ে রেপ করছে ।

এই বাঙালী অফিসারটি অতি বলবান ও বুদ্ধিমান ।

কোনো যুদ্ধে না গিয়ে, চৈনিক ধরে ধরে বর্বিটাইজ করে দিয়েছেন  
.....যারা রেপ করতে অভ্যস্ত ছিলো ।

আর যারা বুদ্ধ মূর্তিতে প্রস্রাব করেছে- তাদের দুই হাতের বুড়ো  
আঙুল কেটে দিয়েছেন । কারো কিছুই বলার নেই । যুদ্ধ করেন  
নি কোনো ।

ছুটি শেষে জলপাইগুড়ির বাড়ি থেকে, বোচকা পিঠে নিয়ে ট্রেনে  
চড়তে উদ্যত হলে, তার মা এগিয়ে গিয়ে গার্ডসাহেবকে বলে  
ওঠেন :: বাচ্চাটা আসামের দিকে যাচ্ছে । যাত্রাপথে ওকে  
দেখবেন একটু । ঠিকমতন নামে যেন । ছেলেমানুষ কিনা ; বড়  
চিন্তায় থাকি পৌঁছ সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত ।

## জিহ্বা

সবাইকে দাঁতের আগায় রাখা ব্যাক্ষ অফিসার টুটুল মুখোপাধ্যায়  
একজন নিয়মিত বক্তা । এত কথা বলে ও বলতে ভালোবাসে  
যে বলার নয় । নিজের গলা নিয়ে খুবই গর্ব তার! দারুণ আবৃত্তি  
করে । বিশেষ করে নজরুলের কবিতা ।

ব্রাহ্মণ সম্ভান টুটুলের- এঁঠোকাঁঠা বিচার ভালই । টয়লেটে গেলে  
পোশাক ছেড়ে , চটি খুলে যায় । স্নান করে বেরোয় । বাইরে  
শুকোতে দেওয়া জামাকাপড় ; লাঠি দিয়ে তুলে স্নানঘরে নিয়ে  
যায় । শুদ্ধতা হারানোর ভয়ে । একেবারে বাতিকগ্রস্ত ।

এইসব ওর মায়ের কাছ থেকে শেখা । বন্ধুমহলে অবশ্য বলে  
থাকে যে জার্মসের ভয়ে এগুলো করা । হাইজিন , সায়েন্স ।

ইদানিং ; এই বখাটে মানুষটির জীভ কাটা পড়েছে, তার  
*glossectomy* করা হয়েছে । কারণ পায়ু থেকে ( মলদ্বার )  
ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছিলো মুখের ভেতরে । গাল ও জিহ্বাও বাদ  
যায়নি পায়ুতন্ত্রের অশুদ্ধতা থেকে । **বিশুদ্ধ মানুষ এখন পোশাক  
পরেই হালকা হতে যায় ।**



## মার্টিন লেভিন

মার্টিন একজন ব্যস্ত অফিসার । সকাল ছটা থেকে রাত আটটা অবধি অফিসে কাজ করে । শনিবারেও কাজে যায় । কেবল রবিবারটা ছুটি ।

লোকটি আগে খুব কাফে থেকে কিনে খেতো । বিকেল পৌনে পাঁচটাতে- কাফের সব খাবার শেষ করার জন্য ফ্রিতে দিয়ে দেয় । বিদেশে বাসি খাবার বিক্রি --সাধারণত: হয়না ।

মার্টিন বেশিরভাগটাই নিয়ে যেতো । ওর সারাদিনের খাবার মনে হয় ও কাফে থেকেই নিতো ।

**যা বেঁচে যাবে তা নেবার জন্য আছে মার্টিন লেভিন ।**

এখন দিনকাল পাল্টে গেছে । এখনও পৌনে পাঁচটায়, ফ্রিতে খাবারগুলো দিয়ে দেয় কিন্তু মার্টিন এখন সকালে বাড়িতে খেয়ে আসে আর টিফিন নিয়ে আসে । খাঁটি ইংরেজ সাহেবের সন্তান মার্টিন টিফিনে আনে লেমন রাইস, কার্ড রাইস, বিসিবেলি ভাত, পোঙ্গল, সম্বর ভাত, রসম্ রাইস ইত্যাদি নানান প্রকারের রাইস । কারণ ওর বর্তমান স্ত্রী একজন দক্ষিণী ।



দ্রাবিড় সুন্দরীকে দেখতে হেমা মালিনীর মতন ; নামও তার হেমা । সে এসে নাকি মার্টিনের জীবনই বদলে দিয়েছে । আগের বৌ কোনো গৃহকর্ম বিশেষ করে রান্না করতো না । দোকান থেকে স্যালাড্ , রোস্ট , বার্গার কিনে এনে ওরা খেতো ।

**এখন হেমার কল্যাণে সব বদলে গেছে ।**

নিউট্রিশাস্ সমস্ত খাবার খায় ওরা । অল্প ওয়াইন আর কফির নাকি অনেক উপকারিতা । গ্রিন-টি আর সবজি ও রংবেরং এর স্যালাড্ খেতে অভ্যস্ত । ফুট জুস্ না পান করে নির্মল জলপানে অভ্যস্ত হয়েছে মার্টিন । আর অজস্র ফল খায় । বিশেষ করে আপেল আর ব্লু- বেরি ।

**হেমা ; আরো আরেকটি দিকে ওকে সমৃদ্ধ করেছে ।**

আগে ওর বাজে খরচের হাত ছিলো । মাইনে পেলেই সব উড়িয়ে দিতো । এখন টাকা জমিয়ে ও অন্য একটা বাড়ি কিনেছে , শহরতলিতে । থ্রি- বেডরুম ফ্ল্যাট । পেছনে বড় বাগান ।

আর ওরা- বছরে একবার দেশের মধ্যে আর আরেকবার বিদেশে অর্থাৎ ইস্টার ও খ্রীস্টমাসে রীতিমতন লম্বা ছুটি নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতে সক্ষম । **সবই- হেমার ইকোনমিক্যাল ও ইকোলজিক্যাল**

**স্বভাবের জন্য । বৌকে মনে হয় একটু বেশি ভালোবাসে । সম্প্রতি বিবাহবার্ষিকীর জন্য একটা সুন্দর বৈদ্যুর্য়মণি কিনেছে । অফিসে সবাইকে দেখাচ্ছে মার্টিন । সবাই দেখছে- পরশমণির জন্য কেনা মহার্ঘ্য মণিটি, নয়নমণি দিয়ে ।**

## মেঘা

মেঘার মুখে মেঘ জমেছে । বিদেশে পড়তে আসা দিল্লীর মেয়েটি ক্রমাগত আক্রান্ত হয়েছে চুরি ইত্যাদিতে ।

ঘরের ভেতর থেকে চুরি গিয়েছে সমস্ত । বিশেষ করে টাকাপয়সা । ক্যাশ টাকা বেশি গেছে দামি বস্তুর থেকে ।

মেঘার রুমমেট এক থাইল্যান্ডের মেয়ে । মেয়েটি খুবই ভদ্রসভ্য ও সৎ । ওর বাবা ও মা এসেও দেখা করে গেছে এইদেশে , মেয়ের সাথে । কাজেই সে যে দুঃস্বরী আর এগুলো করবে না বেশ বোঝা যায় । **কিন্তু পুলিশও রু পাচ্ছে না ।** ভাঙাচোরা অথবা ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন নেই । কে করছে আর কেন- ওরা বুঝতে অক্ষম ।

শেষমেঘ ওদের ক্লাসেরই এক ছেলে, নাম তার অলিভার সে পরামর্শ দিলো --**ক্যামেরা লাগিয়ে রাখতে** । কম্পিউটারে বিশেষ ক্যামেরা লাগিয়ে দেখা গেলো যে ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে ওদের ল্যান্ডলর্ড ; ফায়ারপ্লেসের পাশে- এক গুপ্ত পথ দিয়ে ঘরে ঢোকে ।

রাস্তাটা অভিনব । এমনি বন্ধই থাকে । অর্থাৎ চিম্নির ইটের  
পাইপ বেয়ে অদ্ভুতভাবে ঢোকে । দোতলা থেকে । লোকটি  
আদতে ড্রাগ্‌স্‌ নেয় নিয়মিত । তাই পয়সা লাগে অথচ কাজ  
করেনা কোনো । বাড়িভাড়া দিয়ে চলে । **একা মানুষ । অতএব ।**

### সত্য ঘটনা । লেখিকার বাস্তবীর গল্প ।

## ছিনতাই

কংস করকরান সাহেব হলেও ; আধাসাহেব । মা দক্ষিণী আর  
বাবা সাহেব । কংসের গায়ের রং মায়ের মতন বাদামি ।

লোকটি, এক সংস্থায় বাড়ি তৈরির সমস্ত জিনিস সাপ্লাই দেয় ।

একদিন দুপুরে বাড়িতে খেতে আসছিলো । একটু দূরে বাড়ি ।  
মিনিট কুড়ি লাগে লোকাল ট্রেনে । বাড়ি গিয়ে লাঞ্চ খেয়ে আবার  
কাজে আসে । খুব ভোর থেকে কাজ করে ।

বলে :: আমরা তো রিচার্ড ব্র্যান্সান্‌ নই কাজেই বিল দেবার  
জন্য সারাটা জীবন গাধার খাটনি খাটতে হবে । তবে ভাবছি  
ভালো করে জমিয়ে নেবো । এখন কিপ্‌টেমি করি । সস্তার  
জিনিস কিনি । তাহলে মোটামুটি মধ্যবয়সে অবসর নিতে  
পারবো আর বাকি জীবনটা লাইব্রেরিতে বসে কাটাবো । কত  
কিছু জানা যায় বলতো বই পড়ে , ভিডিও দেখে !

একদিন দুপুরে ঘুঘু ডাকছে । লেকের পাশে রেল স্টেশান ।

রেলের ডিব্বাগুলি ছোট ছোট । লোকাল ট্রেন । যাত্রী সংখ্যা  
অনেক কম । বিশেষ করে দুপুরে ও রাতে ।

**কংস করকরান নেমে, দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলো ।**  
এমনসময় এক এশিয়ার মানুষ এগিয়ে এসে চাকু বার করে বলে

::: যা আছে সব দিয়ে দিন নাহলে প্রাণ যাবে ।

কংসর কাছে সেরকম কিছু ছিলো না । আংটি আর ঘড়ি বাদ দিলে কিছু কড়কড়ে ডলারের নোট, ব্যস্ । দিয়ে দিলো সবই ।

পরে ছিনতাইকারিকে একপাশে টেনে নিয়ে প্রশ্ন করে-- তুমিও এশিয়ার আর আমিও । বিদেশে এসে এসব করছো কেন ?

এতদূরে এসেও যদি এসবই করবে তাহলে এখানে এলে কেন ?

এবার ছেলেটির চোখে, জলের ধারা । **কপল ভিজিয়া গেলো নয়নের জলে** । ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসেছিলো । এখন বেকার । এইদেশে এখন অনেক বেকার । বেকারত্বের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ছিনতাই শুরু করেছে । কারণ তৃতীয় বিশ্বে ফিরতে চায়না । থার্ড ওয়ার্ল্ডে ফিরে যাবার থেকে প্রথম বিশ্বের জেল খাটা অনেক ভালো । কাজেই সে এখন পাকা ঠগ্‌বাজ হয়ে উঠেছে ।

কংসকে লোকে এখানে কন্স বলে । নাম যাইহোক স্বভাবে সে খুবই নরম ,কোমল । কাজেই একটু কিছু কড়কড়ে নোট বার করে ছেলেটিকে দেয় । নেমকান্ড দিয়ে বলে দেখা করতে ।

ছেলেটি অবাক হয় । দেখাও করে অবশ্য । কংস ওর কোম্পানিতে বলে কয়ে ছেলেটিকে চাকরি দেয় । কারিগরি বিদ্যা সংক্রান্ত কিছু নয় অবশ্য । মালপত্র লোডিং আর আনলোডিং করতে হবে ক্লান্টের কাছে গিয়ে ।

**ও রাজি হয় । হাতে স্বর্গ পায় ।**

কংসর নামটা নিয়ে পরে একটা ছোট মন্তব্য করে :: আপনার নামই তো হওয়া উচিত কিবন্ কে কংস রাখলো ?

---আমার বাবা তো সাহেব, তাই উনি জানতেন না যে কংস আদতে কে । চরিত্র জানতেন না কিন্তু নামটা ওঁর ভালোলাগে । যখন জানতে পারেন তখন আর বদলান নি ।

তখন তো ফেসবুক ছিলো না তাই কেউ হারাস্‌ও করেনি বাবা-মাকে -সঈফ আলি খান ও করিনার মতন ।

**সত্য ঘটনা জাত গল্প ।**

## অলকাতিলকা

অলকাতিলকা ; লাক্ষ্মী শহর থেকে গবেষণা করে বিদেশে আসে  
বিয়ের পরে । স্বামী প্রযতের দুটি চাহিদা ছিলো । **লম্বা মেয়ে  
আর পি এইচ ডি ।**

অলকা, বিদেশে আরো গবেষণার সুযোগ পাবে ভেবে চলে আসে  
। বরের একটা শর্ত, মনে ছিলো না ।

**বিয়ের পরে বৌ চাকরি করবে না । ঘরে থাকবে ।**

ও যেই দেশে এসেছে, সেখানে মেয়েরা আগে মানে বছর ২৫  
আগেও নাকি বিয়ের পরে চাকরি ছেড়ে দিতো । ওয়ার্ক প্লেস  
রোমান্স হয়ে গেলেও চাকরি ছেড়ে দিতো ।

কাজেই প্রযতের চাহিদাকেও অন্যায় বলা যায়না ।

আর বাড়িতে একজন গার্ডিয়ান না থাকলে ছেলেমেয়েরা মানুষ  
হবেনা । প্রযত বললো :: **যদি তুমি কাজ করো আমি অবসর  
নেবো** । অতএব অলকাতিলকা কাজ করলো না কোনোদিনও ।

শিশুদের চেয়ারের সাথে বেঁধে রেখে দোকান বাজারে যেতো ।

প্রযত অনেকটা সময় অন্যান্য শহরে থাকতো কাজের কারণে ।

আগে দিনে মোট ৬০০র বেশি কিলোমিটার ড্রাইভ করে কাজে  
যেতো আসতো । পরে অন্য শহরে চলে যায় ।

অলকা চাকরি করেনি বটে তবে এখন কম্পিউটারে বসে  
প্রাইভেট টিচিং দেয় । ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে তার ।  
শিক্ষাদানের জন্য ; অনেক পিছিয়ে পড়া দেশের উদ্যোগী  
ছাত্রছাত্রীরা অনেক কিছু জানতে পারে , শেখে ।

পয়সাও নেয় তবে কম । কারণ বিদ্যা ওর কাছে পয়সা  
রোজগারের রাস্তা নয় । অবসরে বিভিন্ন সার্ভে করে । অনলাইন  
সার্ভে । সেখান থেকে আয় করে এখন বেশ স্বচ্ছল ।

**প্রযত বলে :: তুমি চাকরি না করেও আমার রোজগারে গিল্লী ।**

অলকাতিলকা মিষ্টি হেসে বলে :: চাকরি না করলে কি? আমি  
ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে মানুষ করে দিয়েছি । বিদেশের  
সমাজে বড় হয়েও ওরা বিদেশের খারাপ জিনিসগুলো আত্মস্থ  
করেনি । হয়ত ওরা কেউ বিল গেটস্ কিংবা রবিশঙ্কর নয় কিন্তু  
মানুষ হিসেবে একদম প্রথম সারিতে আসবে ।

কথা বলার ভঙ্গিমায় যেন গোপন ব্যথা লুকিয়ে ছিলো । হয়ত  
আবেগ লুকানোর জন্যই তাড়াতাড়ি কিচেনে পা বাড়ায় প্রযতের  
পছন্দের লম্বা মেয়ে , **মৃত স্কলার- ড: অলকাতিলকা ।**

**বলরামের রোহিনীর মতন , যার মাথায় বাড়ি মেরে নিজের  
সাইজে করে নিতে পেরেছে সে ।**

## তীর ভাঙা ঢেউ

বালাগুরুস্বামীকে দেখতে সুন্দর । রূপবাণ । আমাদের রোজা সিনেমার নায়কের মতন দেখতে । পরবাসে সে মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে । দূরের খনি শহরে থাকে । মাসে একবার বাড়ি আসে ।

দুই সন্তানকে নিয়ে ওর স্ত্রী সুজাতা বসবাস করে অন্য একটি শহরে । সুজাতা একটি অ্যান্টিক শপের ম্যানেজার ।

অনেক মূল্যবান ও অপূর্ণ জিনিস কেনাবেচা করে ওর কোম্পানি । বিভিন্ন শহরে ও দেশে ওদের অফিস আছে ।

একটি রাশিয়ান ডলের অপূর্ণ মডেল একবার অফিসে আসে । কর্মী হিসেবে নিলাম হবার আগেই সন্তায় কিনে নিয়ে আসে সুজাতা । ছেলেপুলেদের খুব পছন্দ হয় দ্রব্যটি । কিন্তু পড়শি মিসেস্ লিভিংস্টোন বলেন যে এসব উটকো জিনিস বাড়িতে না রাখাই ভালো । অনেক সময় দেখা গেছে এর থেকে অমঙ্গল হয় ।

ডলটি এরজন্য দায়ী কিনা কেউ জানেনা তবে এরপরেই স্বামীর ব্যাভিচারের কথা জানতে পারে এবং বিয়ে ভেঙে যায় ।

বালাগুরুস্বামী ওকে অনেকবার বলেছে যে সবই মিথ্যা ।

যার কথা সুজাতা ভাবছে সে এক অসহায় নারী , বিদেশে এসে বিপদে পড়েছে বলেই বালা ওকে সঙ্গ দিয়েছে । নাইদার হি স্পেস্ট উইদ হার নর হি হ্যাজ এনি কাইন্ড অফ ইমোশান্স্ ফর হার । ইট্‌স্ জাস্ট্ আ প্রফেশনাল অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি অ্যাসোসিয়েশান ।

সুজাতা কিছুতেই মানেনি । কারণ কোনো বিপদে পড়া, অপরিচিত মহিলাকে সাহায্য করার অর্থ এই নয় যে তার ঘরে সারারাত কাটাতে হবে । ওর স্বামী , বালাগুরুস্বামী অবশ্যই সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে । বলেছে :: আমি কোনো শব্দের চক্রে ফাঁসতে চাইনা । শুধু তোমাকে জানাতে চাই যে অনেক কিছুই অনেক সময় করতে হয় যার কর্দয় অর্থ বার করে কোনো লাভ হয়না । হিউম্যানিটি বলেও একটা শব্দ আছে জগতে । একজন অসহায়, সম্বলহীনা মানুষকে আমি এইভাবে রাস্তায় বার করে দিতে পারবো না ।

কাজেই সুজাতা দুই সন্তানকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে ।

সদ্য ডাইভোর্স হয়েছে ওদের ; বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সুজাতা আবার বিয়ে করেছে । ওদের অ্যান্টিক কোম্পানির এক অকশন ম্যানেজারকে । বয়সে মোট ২৫ বছরের ছোট । কিছুদিন একই সাথে ছিলো ওরা ।

সুজাতার সব খবর রাখা এক্স স্বামী -- বালাগুরুস্বামী কিন্তু এখনও বিয়ে করেনি। আর কোনোদিন করবে বলেও মনে হয়না বন্ধুদের। বলে :: আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে।

কেউ হয়ত বললো : আবার করো। লোকে তো করে।

বালা :: আমার তো বড় বড় ছেলেমেয়ে আছে। বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে রোমাঞ্চ করার সময় কোথায়? আর দু-তিনবার বিয়ে এইদেশের লোকেরা করে। আমি তো ভারতীয়!

## কৃষ্ণচূড়া

অবিবাহিতা মেয়ে বীথি মল্লিকের এখন মধ্যবয়স। কিন্তু কৈশোর থেকেই সে মাথায় সিঁদুর লাগায়। হঠাৎ সেই লাল সিঁথিতে, রং চটেছে।

বীথির লাল সিঁথি বহু মানুষের কৌতুহল জাগায়।

বিশেষ করে আধাশহর মানিকগঞ্জে এটা নিয়ে লোকচর্চা হয় খুব। সবাই নিজ নিজ মতদান করে। কেউ কুৎসা রটায় কেউবা মায়াবী, দরদী গলায় ওকে সাপোর্ট করে। হয়ত এই হয়েছে, হয়ত সেই হয়েছে, হয়ত ওর কোনো উপায় নেই ইত্যাদি।

## সম্প্রতি মারা গেছে এলাকার ব্যায়ামবীর মিহির নন্দ।

নন্দকিশোর ছিলো যখন তখন থেকেই গায়ে অসম্ভব জোর। বীথির ভাই বিভূতির সঙ্গে কুস্তি লড়তো। দুজনের খুব ভাব ছিলো। স্কুলের মেয়ে বীথিকে একদিন খেলার ছলে পরিয়ে দিয়েছিলো নকল সিঁদুর।

## শাল পিয়ালের বনে গিয়ে ওরা সবাই খেলছিলো।

সেইসময় রাজটিকা পরানোর মতন করে বলবান মিহির, বীথিকে

সিঁদুর পরিয়ে দেয়। তারপর খেলনা রথে করে ওকে নিয়ে পালায়। মিহির ভীষ্ম হয়ে; ওকে অশ্বা ফস্বা বানিয়ে খেলছিলো। রথটি আসলে প্রতিবার রথযাত্রার পরে, পথের একপাশে পড়ে পড়ে নষ্ট হত। পরের বছর নতুন রথ তৈরি করা হত। রথের মেলায় বীথিকে কাঁচের চুড়ি কিনে দিতো মিহির। পেস্তা, বেগুনি আর গাঢ় লাল এই কটা রং ওর প্রিয় ছিলো।

মজা করে আঙুল কেটে, রক্তকণিকা নিয়ে বীথিকে নকল সিঁদুর পরিয়ে দেবার পর থেকে ও নিয়মিত সেই সিঁদুর লাগাতো।

আগে বাড়ির লোকে ভাবতো খেলাঘরের খেলনা সিঁদুর।

বাস্তবে হয়ত তাই ছিলো কিন্তু অন্তরে রং লেগেছিলো মেয়েটির। তাই মিহির বিয়ে করলেও বীথি আর বিয়ে করেনি। প্রথমদিকে চাপ দিলেও পরে বাবা-মাও কিছু বলেনি।

বিউটিশিয়ান কোর্স করে নিজের দোকান চালায়। সারাটা দিন সেখানে হিন্দী সিনেমার গান চলে।

সোনাক্ষী সিন্হাকে দেখতে রীনা রায়ের মতন, ও একটুটা লার্জ সাইজ, ওর কপালে শত্রুঘ্ন সিন্হার মোটরগাড়ির সারি দাঁড়িয়ে থাকে, অনুষ্কা শর্মার হাঁ মুখটা বড়, ঐশ্বর্য রাইয়ের নাকটা বোঁচা আর ওপরের ঠোঁট আর নাকের মাঝে কম জায়গা,

প্রিয়ংকাকে দেখতে একদম ডোনাল্ড ডাকের মতন মানে ওর ঠোঁটটা, সানি লিওনি আর রীনা রায়কে নাকি অনেকটা একরকম দেখতে, শিল্পার ফিগার লা জবাব আর ও যেই রেসিপি দেয় সেগুলিও স্বাস্থ্যকর, শাহিদ্ কাপুড়ের মধ্যে হিরো মেটেরিয়াল নেই, সঞ্জয় দত্তের বৌ মান্যতা রূপবতী তবে ওদের মেয়েটাকে দেখলে ঝোড়ো কাক মনে হয়, ক্যাট্টিনার চিক্‌নি চামেলি নাচের জবাব নেই, এরকম নাচ নাকি আগে দেখেনি ওরা, সল্লুভাই বিয়ে করবো বলে তারপর ভেঙে দেয়, রণভীর সিং খুব পেশিবহুল তবে মাথাটা ঝাঁকিয়ে খুস্কি ফেলে তাতড় তাতড় করে, এয়সে এয়সে এই এয়সে এয়সে করে নেচে দেখায় ওরা। ওর নাকি বীথির কাছে আসা উচিৎ খুস্কির জন্য --- অর্থাৎ বিনোদন জগতের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা আর মজা লোটা।

**কখনো পথভুলে আসে মিহির স্বয়ং। মেয়ের চুলে ছাঁট দিতে।**

মিহিরের বাড়ির লোক, ওকে বাইরে যেতে দেবেনা বলে ও এই আধাশহরে আছে। এখানে ব্যায়ামের ক্লাব চালায়।

বৌ অনিমা, সেখানে ক্যাশ সামলায়। বীথির সাথে বন্ধুত্ব আছে ওদের।

মিহির একবার ওকে বলেছে : তুই বিয়ে করিস্ নি কেন ? বিয়ে করে ফ্যাল্। একা একা জীবন কাটাচ্ছিস্ কেন ?

বীথি দূর-দিগন্তে দৃষ্টি হেনে বলেছে :: কারণ অন্য কেউ আমার আগে বিয়ে করে ফেলেছে বলে !

মিহিরের চোখ চলে গেছে সবুজ সবুজ শালবন থেকে গাঢ় লাল কৃষ্ণচূড়া পথে।

মিছিমিছি সিঁদুর পরানো যে কারো জীবন বদলে দিতে পারে এগুলি নাটকে, যাত্রায় দেখেছে। বাস্তব জীবনেও এসব সম্ভব আর তারই সঙ্গে এরকম ঘটেছে দেখে মিহিরের বুকে রোমাঞ্চ হলেও একটা গভীর দুঃখের ঢেউ বয়ে যায় হৃদয় কুঠুরিতে।

ও কি বীথিকে ঠকিয়েছে ? কিন্তু ছোটবেলায় কোথায় কী হয়েছে তার জন্য কেউ নিজের স্বাদ আল্লাদ বিসর্জন দেয় ?

অনেক প্রশ্ন ভেসে উঠেছে মন ক্যানভাসে।

**মুখে শুধু বলেছে :: পরের জন্মে কেউ হয়ত তোর সঙ্গে একই দিনে মালাবদল করবে। কী বলিস্ ?**

বীথি শুধু হেসেছে। তাতে অবিশ্বাস ছিলো না। ছিলো অদেখা প্রশান্তি। যেমন শান্তি একমাত্র মনোবাসনা পূর্ণ হলেই মেলে।

## ফাটল

মেয়েকে একা বিদেশে যেতে দেবেনা উস্কার পরিবার ।

উস্কা নায়েক --একজন সফল উকিল । বিদেশে গিয়ে **ল** নিয়ে আরো পড়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে । কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারে ওর বাবা ও মা চেয়েছিলো যে বড়মেয়ে উস্কা ওকালতি করে সংসারের হাল ধরুক । সাত ভাইবোনের মধ্যে উস্কা সবার বড় । ওর পরের ভাই ওর চেয়ে মাত্র একবছরের ছোট । নাম গৌর ।

গৌরও মেধাবী । ও অংকে পারদর্শী । বিদেশে অর্থনীতি নিয়ে পড়তে যাবার জন্যে স্কলারশিপ্ পায় । কিন্তু সংসারের হাল ধরে । উস্কারও একই হাল হয়েছিলো কিন্তু সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় ।

দিল্লী গিয়ে, এক ধনীর অপোগন্ড পুত্রকে বিয়ে করে । লোকটি কর্পোরেট কর্মী হলেও খুবই অহঙ্কারি ও মেজাজি । ফলে প্রায়ই চাকরি চলে যেতো । ওর বাবা এক আমলা হওয়ায় বারবার চাকরি পেয়েও যেতো । আসলে ওর গার্লফ্রেন্ড মারা যায় দুদিনের রহস্যময় জ্বরে । সে ছিলো উস্কার ক্লাসমেট । মারা যাবার সময় উস্কার হাত ধরে বলে যায় যে এই লোকটিকে যেন সে দেখে । লোকটি একটু স্ক্যাপাটে কিন্তু মানুষ ভালো ।

উস্কার মনে রং লাগার চেয়েও বেশি প্রয়োজন ছিলো আশ্রয়ের ।

গ্রামীণ জীবন আর সংসারের হাল ধরে নিজের প্রফেশনাল জীবনে

সর্বনাশ ডেকে আনা কোনটাই ওর মনের মতন ছিলো না ।

কাজেই বিয়ে করে ফেলে পরিবারকে না জানিয়ে ।

যথাসময় বিদেশে চলে যায় ।

পরে ওর তিনটে মেয়ে জন্মায় । কিন্তু কেউই বিবাহিত জীবনে সুখী নয় । স্বামীর চোখ নষ্ট হয়ে গেছে ব্লাড সুগারে ।

তাকে দেখার জন্য লোক লাগে । একটা হোমে দিয়ে আসে ।

সারাদিন থাকে । বিকেলে বাড়ি ফেরে ।

মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে এইটুকুই রক্ষা।

উকিল, সাইকোলজিস্ট আর গ্রাফিক ডিজাইনার ।

বড়জনের স্বামী বিয়ের প্রথম রাতে তাকে ছেড়ে চলে গেছে কারণ তার নাকি স্তন খুব ছোট । আগে বোঝেনি কিন্তু এই মেয়েকে নিয়ে সে থাকবে না ।

দ্বিতীয়জনকে দৈহিক অত্যাচার করতো তার লম্পট স্বামী ।

বিচ্ছেদ হবেই । আর ছোটজনের স্বামী পাড় মাতাল ।



মাসের মধ্যে কুড়ি দিন হাসপাতালে কাটায়। লিভারে পচন ধরেছে। আরো নানান ব্যাধি তাই মুখ দিয়ে বিষ্ঠা উঠে আসে মাঝেমাঝে। সেও খরচের খাতায়।

**নিজের স্বার্থপরতাকে দায়ী করে উদ্ধা এখন।**

বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পরে ওর মা নাকি সাতদিন খাট থেকে ওঠেনি। এতবড় ধোকা হয়ত ভদ্রমহিলা মেনে নিতে পারেন নি। ছোট ছোট ভাইবোনগুলোকে আঁধারে ঠেলে দিয়ে; মধ্যবিত্ত মেয়ের বিশ্বজয়-মায়ের আঁচলে আঁচড় কাটে।

কথায় বলে, মায়ের অশ্রু, ঝরানো ভালো নয়।

সাতদিন পরে ঘর থেকে বেরিয়ে মা শুধু বলেছিলো ::

**ও মানুষ নাকি পাষণ্ড ?**

এগুলো সবই উদ্ধা পরে শুনেছিলো। ভাইবোনেদের কাছে।

ওদের পরিবারে এখনও নিয়ম করে অশ্রু ঝরে; শুধু সেটা এখন উদ্ধার চোখের জল।

আর অগ্নিকুন্ড থেকে অবিরাম জলরেখার সৃষ্টি হলে তা তো পূর্ণতা পাবার আগেই নিভে যায় কাজেই জলতরঙ্গ বাজতেই থাকে। থেকে থেকে, প্রচণ্ড বেসুরে।

**ওর মা যেন ওকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে- এতবছর পরে।**

## ডাকাত

ট্রাক ব্যবসায়ী; মল্লার কুন্ডুর সুবিশাল বাড়ি। ইন্টার স্টেট ট্রাক ও লরির ব্যবসায় ফুলে-ফেঁপে ওঠা মল্লারকে ওর মারোয়াড়ি ও গুজরাতি বন্ধুরা ডাকে মল্‌হার বলে।

মল্লারের বাবার -বিশাল নাহলেও সম্পত্তি মন্দ ছিলো না। লোকটি কাঁসা পিতল নিয়ে কাজ করতো। কমবয়সে ওদের চার ভাই ও এক বোনকে রেখে মারা যায়।

বড় দাদা কেমার, সরকারি চাকরিতে ঢুকে ওদের দাঁড় করায়।

পরে মল্লার ও পরের ভাই মন্দারের, যুক্ত ট্রাকের ব্যবসায় ওরা রীতিমতন ধনী হয়ে ওঠে।

মন্দার এখন আলাদা হয়ে গেছে।

একমাত্র বোন মালতীর বিয়ে হয়েছে এমন এক পাত্রের সাথে যে ঘরজামাই থাকে মল্লারের বাড়িতে। বৃদ্ধা মাও এখানেই থাকে। থাকে ছোট ভাই ইন্দর। জামাই মহাশয়ের কোনো সন্তানও নেই। অসম্ভব পেটুক লোকটি। **ওদের বিশাল দোতলা রসুই ঘর; বাড়ির অন্যদিকে।** কিচেন একতলায়- সামনে বারান্দা। সেখানে ঢুকেই বড় খাবার জায়গা। এত বড়লোক হলেও ওরা মাটিতে বসে খায়। রসুইঘরের দোতলায় স্টোর রুম। সব নিয়ে আলাদা একটি ইউনিট আর কি !

সবার খাওয়া হয়ে গেলে ওখানে তালা মেরে দেওয়া হয়। জামাই বাবাজী ঘটেশ্বর; যাকে সংক্ষেপে লোকে ঘটো বলে ডাকে সে একটি লম্বা বাঁশের সিঁড়ি নিয়ে -দোতলার স্টোরে হানা দেয় প্রায়ই। লুকিয়ে। অজস্র খাদ্যকণা সংগ্রহ করে, খেতে খেতে বাগানে ঘোরে। লোকটির সহজে পেট ভরে না। মল্লার ও ইন্দরের বিশেষ প্রিয়পাত্র বলে কেউ কিছু বলতেও পারেনা শুধু মাঝেমাঝে ওর স্ত্রী ওকে কটু ভাষায় কটাক্ষ করে।

**মজা করে মল্লার ও ইন্দর ওকে ডাকাত বলে ডাকে।**

সবাই কেবল ভাবে- যখন বাড়ির লোকে ওর চুরির ব্যাপারটা জানেই আর কিছু বলেও না কেউ, তখন ও সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে খায় না কেন?

ওদের বৃদ্ধা মা বলে :: মনে হয় অতিভোজন করছে তাই লজ্জা পায় সামনে দিয়ে যেতে। আমাদের খুকির এমন দূর্ভাগ্য যে এমন জামাই জুটেছে।

**আসলে খুকি অতিক্রিয়া। হিন্দি সিনেমার টুনটুনের মতন দৈহিক গঠন কাজেই পাত্র জুটছিলো না।**

যে যাই বলুক না কেন আসল ঘটনা হল এই যে ঘটো, বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে উঠে- স্টোররুম থেকে চুরি করে খাবার নিয়ে- ওদের নদীর ধারে যায়। সেখানে একটা স্বপ্নে পাওয়া কালীমায়ের মন্দির আছে। সেই মন্দির চত্বরের বহু ভিখারি থাকে। সন্ধ্যা গাঢ় হলে ঘটেশ্বর; মন্দিরের ঘটে নাহলেও ওদের ভিক্ষার ঝুলিতে ভরে দেয় অফুরন্ত আনাজ ও সবজি। শুভলগ্নে মিষ্টিও। হয়ত ঝানু ব্যবসাদার মল্লার ব্যাপারটা জানে, তাই জেনেশুনেও ডাকাতকে প্রশ্রয় দেয়।

## সমাজ সংস্কারক

**ভারতে ফিরেছে জন নাগ।** উত্তরবঙ্গের এক শহরে বাড়ি কিনে আছে। প্রায় চল্লিশ বছর পরে ফিরেছে। আগে স্বপাক আহার করতো এখন এক দরিদ্র স্কুল মাস্টারের মেয়েকে বিয়ে করেছে; সেই রাঁধে বাড়ে। তার নাম উত্তরা কর্মকার।

উত্তরাকে অল্পস্বল্প ইংলিশ শেখাচ্ছে তার স্বামী।

সাহেবি কায়দায় অভ্যস্ত, হাই হ্যালো, নাইস অফ ইউ, ইট্‌স মাই প্লেসার ইত্যাদি বদলে ফেলতে হয়েছে। দামী গাড়ি অবশ্য চড়ে। নেপালে, ভূটানে যায়।

গরীবের মেয়েকে, এমন এক মানুষ বিয়ে করেছে দেখে মেয়ের বাড়ির সবাই খুবই আনন্দিত।

লোকটি মানে জামাতা জন নাগ বিদেশে কী করতো ওরা বোঝেনা তবে সহজ ভাষায় যা বলেছে তা হল ভিডিওর ব্যবসা। আদতে পর্ণো সিনেমার ব্যবসা করতো। অ্যাডাল্ট ব্যবসা।

অ্যাডাল্ট শপ্‌ও চালাতো। এখন দরিদ্র এক ভারতীয় মেয়েকে বিয়ে করে সমাজ সংস্কারের দিকে ঝুঁকিয়েছে।

**কিছুটা হয়ত আঁচ করেছে ওর বৌ উত্তরা। ওর দেওয়ালে একটি পরিচিত মুখ দেখে। সানি লিওনি।**

সমাজ সংস্কারকের অতীত নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনই মানে হয়না সেটাও বোঝে উদ্ভরা । কারণ আজ সে সুখী , সম্মান পেয়েছে একজন **এন আর আইয়ের ঘরগী** হিসেবে আর কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বার করার কোন ইচ্ছেই তার নেই কাজেই জন নাগের সাথেই আছে হরষে বিবাদে ।



## হস্তা

আকাশে যার বাস সেই নক্ষত্রের নামে নামকরণ করলেও মানবী হস্তা একটু অন্যরকম মানুষ ।

বিভিন্নভাবে লোককে ঠকানো ওর নেশা । ভারত থেকে ভস্ম এনে মানুষের উপকার করে বলে বাজারে নাম আছে । ওয়েবসাইট খুলে দূরদূরান্ত থেকে ক্লায়েন্ট ধরে । সবাইকে ম্যাজিকাল ভারতের ভস্ম দিয়ে সুস্থ করে ।

ভারতের জাদুতে অনেকেই মুগ্ধ । জড়িবুটির দেশের অনেক কিছুই এখন বিদেশীরা জানে আন্তর্জাল আর স্বামী রামদেবের কল্যাণে । তবে বেশিরভাগ ভস্মের এত দাম যে সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে । সেই সুযোগটাই নেয় হস্তা গাঙ্গুলি । ব্রাহ্মণ সন্তান বলে গর্বিত । ব্রাহ্মণত্ব ওর অহংকার । বিয়ে করেছে এক কায়স্থর ছেলেকে । উঠতে বসতে তাকে কটাক্ষ করে, জাতপাত নিয়ে ।

লোকটি ভালোমানুষ ও শান্তিপ্রিয় । তাই এখনও মিনি উগ্রপন্থার দিকে পা দেয়নি। গৃহযুদ্ধে, শান্তি আনতে সবরকম কাজ করে । বৌকে খুশি করতে তার পা টিপেও দেয় ।

বৌ কেবল বিদেশীদের ভস্ম দেয় । তাবিজের ভেতরে থাকে এই ভস্ম । ওর দোকানে গেলে ফ্রিতে নিরামিষ সিঙাড়া আর চা মেলে । কোনো কোনো শুভলগ্নে নিরামিষ পিৎজা আর ফ্রেঞ্চ

ফ্রাইস্ । সবই ফ্রিতে । এটা ভারতীয় সংস্কৃতির নমুনা । অতিথি ভোজন , অতিথি নারায়ণ , বসুধৈব কুটুমবকম্ ।

বিদেশীরা হাঁ করে দেখে । আর ভস্ম তো আছেই !

ইন্ডিয়া থেকে আনায় তাই কস্ট একটু বেশি তবে বাজার চলতি বস্তুর থেকে অনেক অনেক কম । আসলে সে দেয় স্বর্ণ , হীরক, রূপা ভস্ম । এতে নাকি নানান দূরারোগ্য ব্যাধি সেরে যায় । এই ভস্ম ব্যবহার করে অনেকের সারে, অনেকের সারেও না কারণ আসল ডাস্টের সেইরকম গুণ থাকলেও, হস্তা কোনো ভেষজ চিকিৎসক নয় , সে এমনি এগুলি করে । হাতুড়ে ডাক্তারের মতন ।

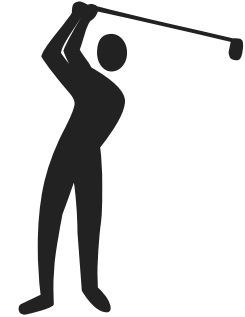
লোকাল এক জহুরির কাছ থেকে সস্তায় কিনে, এইসব ডাস্ট দিয়ে তাবিজ বানিয়ে- বিদেশী ঠকানো হস্তার আবার নিজ গৃহপালিত পশু- যার পোশাকি নাম স্বামী, তার চাকরি ও পোস্ট নিয়ে অসম্ভব গর্ব ! স্বামীর কল্যাণেই বিদেশবাস সম্ভব হয়েছে । স্বামী তার দক্ষিণ হস্তও, মানে চাকরা আর কি ! সে একটি সংস্থার ডেপুটি ডাইরেক্টর । নিন্দুকে বলে ::ডেপুটিতেই এত দাপট ? ডাইরেক্টর হলে না জানি কী হত !!

আগে ফার্স্ট ক্লাস দেশের সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হবেনা বলে বিদেশে সেটেল হতে চায়নি আর এখন বিদেশের মধু টেস্ট করে মধুলোভী ভোমরা হয়ে উঠেছে । বড় মসৃণ জীবন পরবাসে !

বিদেশে এখনও মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করে । তাই আজও ক্লায়েন্ট আসে ওর অফিসে, দোকানে । মৃতসঞ্জিবনী সেই ভস্মের লোভে, প্রতিদিন ।

কিন্তু এটা বিদেশ । ফার্স্ট ক্লাস দেশ ! তাই বুঝি সত্যি সত্যি এই থার্ড ক্লাস সিটিজেনকে একদিন পুলিশে ধরে এবং পাক্কা ৫০ বছর পরে ওর সিটিজেনশিপ ক্যান্সেল করে দেয় । ওকে দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয় আইন অনুসারে ।

গগনচারী, হস্তা নক্ষত্রের কোনো স্ফুলিঙ্গও আর বাঁচাতে পারেনা তাকে ।



## প্রযুক্তি

বিখ্যাত অভিনেতা বা **স্টার আদম সিং**, পা ছুঁয়ে প্রণাম করার সময় নাকি উঠতি নায়িকাদের পশ্চাৎদেশে হাত দিতে অভ্যস্ত । অনেক মেয়ে অভিযোগ করলেও, আজ পর্যন্ত কেউ ওকে হাতেনাতে ধরতে পারেনি ।

দু-একজন ওর বিরুদ্ধে কেসও করেছে কিন্তু কোর্টে কিছুই প্রমাণ করা যায়নি আর আইন তো প্রমাণ চায় ।

মনমরা হয়ে যায় মেয়েরা ! স্থির করে , ওকে আর প্রণাম নয় ।

তবুও অনেকেই নতুন উদ্যমে প্রণাম করতে উদ্যত হয় । **এত বড় ফিল্মি হিরো !**

বিদেশ থেকে এক যুবতী, যে মিস্ এশিয়া হয়েছিলো , সে একবার ভারতে যায় । এখন স্বামীর সাথে এশিয়ার অন্য উন্নত দেশে থাকে । সেখানে প্রযুক্তি খুব এগিয়ে । সবকিছু করার জন্যই মেশিন আছে । পিঠ চুলকাচ্ছে ? একটা ইলেকট্রনিক হাত

এসে সুন্দরভাবে পিঠ চুলকে দেবে । একটু জোরে আবার মিহি করে আবার বুলিয়ে মানে দারুণ ব্যাপার ।

এই প্রাক্তন মিস্ এশিয়া , ঐশী দত্ত- ভারতে যাবার আগে স্বামীকে জানায় এই স্টারের ব্যবহার ও ব্যাভিচারের কথা ।

ওর স্বামীর বক্তব্য হল :: **ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ল্ডের লোকগুণি বেজায় খারাপ । ওদের না কোনো মরাল আছে না এথিকস্ !**

**নোংরামোতে নোবেল প্রাইজ থাকলে সবকটা পেতো ।**

ঐশী তর্ক করেনা । লজিক বনাম ক্রিয়েটিভিটির লড়াই বহুল প্রচলিত ।

সময়মতন মুম্বাই পৌঁছায় । প্রাক্তন মিস্ এশিয়াকে আদতে এক পুরস্কারে ভূষিত করতে চলেছে এক ফিল্মি সংস্থা ।

মায়ানগরের মায়া নয় **আসল মূর্তি** হাতে নিতে যথাসময়ে হাজির হয় স্টেজে , ঐশী দত্ত । সেই প্রখ্যাত, লাইম-লাইট অবসেসড স্টার যিনি ক্যামেরা ছাড়বেন না বলে এখন মৃত সৈনিকের রোল করেন , তিনিও হাজির স্টেজে । নানান বক্তৃতার পরে উনি পুরস্কার তুলে দেন ঐশীর হাতে ।

হঠাৎই প্রচণ্ড জোরে ও তীক্ষ্ণ শব্দ বেজে ওঠে এক আজব বাঁশি । পিন ড্রপ সায়লেন্স তখন , হাততালি শুরু হয়নি কারণ ঐশী সেই স্টারের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেছে । লোকে অবাক হয়ে চোখ চাওয়াচাওয়ি করছে । হল কী ? টেরিস্ট অ্যাটাক্?

আসলে ঐশীর ইঞ্জিনিয়ার স্বামী ওর হিপে, স্বরচিত- একটি সেন্সার লাগানো বিশেষ কোমড বন্ধনী পরিয়ে দিয়েছিলো । কেউ হিপে টিপ্ দিলেই যা নিজে থেকে বেজে ওঠে ।

## অপার্থিব

হিমালয়ের এক বরফরাজ্যে ; স্কি করতে গিয়ে আলাপ হয়েছিলো  
এক ভারতীয় মেয়ের সাথে, জেসন রিভের ।

সদ্য বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া রিভের সময় খুব খারাপ যাচ্ছিলো ।

মা মারা গেছে । বাবাকে অসুখে ধরেছে । বৌ-ও পলাতকা ।

কাজেই মনমরা জেসন, পাহাড়ে- প্রিয় স্কি করতে যায় একটি  
বন্ধু গ্রুপের সাথে । এদের সাথে আলাপটিও বড় আজবভাবে  
হয়েছে । একদিন জেসন ট্রেনে করে, দুপুরে বাড়ি ফিরছিলো ।  
তখন এদের এক সদস্যও ট্রেনে করে যাচ্ছিলো । দুপুরের ফাঁকা  
ট্রেনে মুখ গোমড়া জেসনকে দেখে প্রশ্ন করে, সহযাত্রী মিস্টার  
আছজা, কেন সে এত মনমরা । সঙ্গী পাবে মনে করে একা  
থাকা জেসন, ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় গল্পের অজুহাতে  
। সেখান থেকেই এই দলের সাথে বন্ধুত্ব । নিয়মিত ওরা  
একসাথে খেতেও যেতো ।

জেসনের হিমালয় সফরে , খুঁজে পেলো বিধবা নীলম্কে ।

স্কি করতে গিয়ে কাঁধে চোট লাগা সত্ত্বেও ও রাতের বেলায় পাবে  
নাচতো । লোকাল পাব । সেখানে নীলম্কে পায় । পরবাসে,  
নীলম্ ওকে সাহস যোগায় আর মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে  
ভরিয়ে দেয় ওর একাকীত্ব ও বিদেশ বাসের অস্বস্তি ।

পাহাড়ে অভিযানের পরে যেটুকু সময় থাকতো , ওরা একসাথে  
গরমাগরম চা পান করতো । দূরে বরফের পাহাড় । কিছুটা  
কোল্ড ডেসার্টের হাতছানি আর ওদের বড় বড় তাঁবু ।

ভেসে আসে বৌদ্ধ গীত । টুং টাং আওয়াজ আর সিডিতে Ani  
Choying Drolma এর - Great Compassion Mantra  
শুনতো । এই গান আগেও ইউ-টিউবেও শুনেছে । কিন্তু নীলম্  
এর গলায় শুনে খুব ভালোলাগতো ।

এরকম চারুশীলা নীলম্-ই ওকে ছেড়ে দিলো শেষে ।

ও নাকি নান্ হবে । হিমালয়ের নানান মনাস্থিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে  
সেই কারণে । ওর বাবা মায়ের আপত্তি আছে কারণ নান্ হওয়া  
সহজ নয় , নানের জীবন খুব কঠিন । অনেক কষ্টসাধ্য সাধনার  
আওতায় আসতে হয় , অবসেসিভ্ খটস্গুলিকে কন্ট্রোল করার  
জন্য । **কোয়াইট্ মাইন্ড কিংবা নো মাইন্ড স্টেটে যাওয়া সোজা  
কথা নয় ।** অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় । মেয়ে কি পারবে  
এইসব? এত কমবয়সে ? তাই ওর বাবা মা খুবই চিন্তিত ওকে  
নিয়ে । নীলম্ কেবল হিমালয়ে ঘুরে বেড়ায় । শান্তির আশায় ।  
বিভিন্ন গুম্ফায় লামাসঙ্গ করে । মাথা ন্যাড়া করে ফেলেছে ।  
পরগে মেরলন লুঙ্গির মতন পোশাক যা কিনা দেহের উপরিভাগেও  
জড়ানো । কানে তামার রিং । এই ভারতীয় মেয়ের প্রেমে  
পড়লেও, সে তাকে ছেড়ে দেয় ; ওর নিজের লজিক আছে এই  
বিচ্ছেদের । কথায় বলে, **নীলা নাকি সবার সয়না ।** হয়ত জেসন  
সেরকম কেউ ।

ওকে বলেছিলো যে বাসায় বসেও সন্ধ্যাস নেওয়া যায় । অনেক সাধু-সাপ্তী তো বিয়ে শাদিও করেছেন !

কিন্তু নীলম্ এসব শোনার বান্দা নয় । তার মতে কেউ কেউ বিয়ে করলেও, ও সাধু মানে অবিবাহিত মানুষই ভাবে ও পছন্দ করে তাই বৌদ্ধ্য হতে চাওয়া । আর বিয়ে তো ও করেছিলো !

খুব ভেঙে পড়ে জেসন । যদিও বা হিমালয়ে এলো মন ভালো করতে, প্রিয় স্ক্রিয়িং করে-- কিন্তু দেখা গেলো মনটা আবার ভেঙেই গেলো । চুরমার হয়ে গেলো বলাই ভালো ।

**ফেরার দিন ঘনিয়ে আসছে । নীলম্ তবুও তাঁবুতে আসে ।**

গরম চা খেতে আর Ani Choying Drolma এর গ্রেট কম্প্যাশান মন্ত্র শুনতে । তখন ওকে স্যান্ডউইচ খেতে দেয় জেসন । নিরামিষ খায় সে । তাই ভেজ স্যান্ডউইচ । একস্ট্রা চিজ নেয় সবসময় । জেসন রসিকতা করেই বলে :: চিজ খাওয়া আর পাবে যাওয়াটা কমাতে হবে নান্ হতে গেলে !!  
(ডার্ক হিউমার)

ফেরার সময় পোর্টারের সাথে নীলম্ও অনেক দূর এলো ।

বিমানবন্দর থেকে প্লেন ধরে দিল্লী আসার কথা ।

মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে ওর । ভীষণ তচনচ করে দিয়েছে হিমালয় । মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক । তবুও বারেবারে অজ্ঞানার দিকে ছুটে চলি আমরা । মনে- চন্দনের স্নিগ্ধ প্রলেপ দিতে এসে কী বিড়ম্বনা ! মন আয়না ভেঙেচুরে একাকার ।

দিল্লী অবধি পৌঁছে একটু খেয়ে নিলো এয়ারপোর্টের দোকানে । কিছু গিফট কিনলো । তারপর লাউঞ্জে বিশ্রাম নিতে গেলো ।

গভীর রাতে দেশের বিমানে চড়বে । প্লেন গিয়ে থামবে দোহাতে । সেখান থেকে অন্য প্লেনে সোজা দেশে !

দিল্লী থেকে দোহা অবধি ঘুমিয়েই কেটে গেলো ।

দোহা থেকে প্লেন বদলে অন্য প্লেনে । ওদের দেশের প্লেন কোম্পানি এটা ।

যখন সীটে গিয়ে বসলো তখন পুরো ও-হেনরির গল্প ।

ওর পাশের সহযাত্রীকে দেখে ভূত দেখার মতন চমকে উঠলো ।

ওর বিচ্ছেদ হওয়া স্ত্রী মারিয়াম । মারিয়াম এখানে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দেখতে এসেছিলো । পেশায় সাংবাদিক ওর স্ত্রী বর্তমানে একটি গসিপ্ ম্যাগাজিন চালায় । বলে :: এগুলোরও দরকার আছে । পরের ওপরে স্পাইয়িং করে করে মজা নেওয়া আর কি । জেসন বুঝতে পারেনা যে একজন সিরিয়াস সাংবাদিকের গসিপ পত্রিকা খোলার কী দরকার থাকতে পারে অথবা পরের জীবনে পোদ্দারি করা কবে থেকে ওর কাজের মধ্যে চলে এলো ।

কিন্তু অবাকের সাথে সাথে খুশিও হয়েছে। ওকে ; জেসন খুব ভালোবাসে। নীলমের থেকে অনেক বেশি। নীলম্ কথাও বললো ওকে। ওর চোখের কোণায় ঈষৎ হাসি।

ওকে সময় দিতে পারতো না মারিয়াম, কাজের কমিটমেন্টের জন্য। এখন গসিপ্ পত্রিকা চালায় বলে অনেকটা সময়ই বাড়ি থেকে কাজ করে। কাজেই সময়ের আর তত অভাব নেই।

শেষদিকে-- আগের মতন ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলো মারিয়াম। চৌকো মুখ, সোনালি চুল আর সেক্সি ঠাঁটের মেয়ে।

ওর বিভাজিকা দেখা যাচ্ছে, সবুজ পোশাকের মধ্য দিয়ে।

ক্রমশ জেসন লোভী পুরুষ হয়ে উঠছে।

নামার সময় নিজের কার্ড দিলো মারিয়াম ; একদিন বাড়িতে ডিনার করতে ডাকলো। এমন একদিন যেদিন শুধু ওরা দুজন থাকবে আর কেউ না।

**জীবনের প্রতি বাঁকেই ও হেনরি। তাই তো উনি জেসনের প্রিয় লেখক !**

## রাজনন্দিনী

রাজনন্দিনী মন্দিরার জন্য ফ্রেপে উঠেছিলো সেনা অফিসার কমল কুমার। সেনাবাহিনীতে কাজ করা এই বিবাহিত যুবকের রূপ ও বীরত্ব ; লোকচর্চার বিষয় রীতিমতন। মন্দিরাকে খুবই সুন্দর দেখতে। সোনালি বেদ্রের মতন অনেকটা। অনেকটা মৌসুমির মতন। মৌসুমি চ্যাটার্জী।

**অভিজাত, রুচিপূর্ণ এই রাজনন্দিনী, বহু পুরাতন এক রাজ পরিবারের বংশধর। ঠাট্টাট আগের মতনই আছে। এখন ব্যবসায় ঝুঁকেছে সবাই।**

বিবাহিত সেনা-অফিসার নিঃসন্তান। স্ত্রী একা পিত্রালয়ে থাকতো। ওখানে একটি স্কুলে পড়াতো সে। নাম রত্নাবলী।

রত্না একদিন জানতে পারলো, তার স্বামীর এই অভিশপ্ত ভালোবাসার কথা। ডুবে গেলো মদে। ওর বাবাও আর্মিতে ছিলেন তাই বাড়িতে মদের প্রচলন ছিলো। ছিলো ছোট্ট একটি বার। মদ্যপান করে করে কয়েক বছরের মধ্যে লিভারের অসুখে মারা গেলো যুবতী রত্নাবলী। স্কুল থেকে যাকে বিতাড়িত করে ওদের প্রিন্সিপ্যাল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পরেই যেন চেতনা ফেরে কমলের। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে ততদিনে।



রাজকুমারী মন্দিরা, ওর সাথে সম্পর্ক পাতালেও বিয়ে করলো  
এক মুসলিম যুবককে যার রক্তে নবাবের কণিকা ছিলো ।

দুই রাজবংশ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো ।

আজ ২৫ বছর পরে, ছেলেপুলে নিয়ে ঘোর সংসারি রাজনন্দিনী  
মন্দিরা বেগম । সুখে আছে, ভালো আছে ।

সব হারানো সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার কমল কুমার এখন  
থাকে এক বস্তিতে । এক কামরার এক বাসায় । সামনে বস্তির  
চারকোণা চৌবাচ্চা । আকারে বেশ বড় । সবাই জল তোলে ।  
কেউ কেউ নেমে স্নান করে । আর অজস্র হাঁস ওখানে ভেসে  
বেড়ায় ।

মেয়েদের কাঁচের চুড়ির দোকান চালায় কমল কুমার । অবসর  
নিয়ে বাকি জমানো টাকায় এই দোকান খুলেছে ।

শেষদিকে কোনো কাজ করতো না । এখনও একবেলা খায় ।  
কারণ খন্দের সেরকম হয়না ।

রাজনন্দিনীকে আসলে এক বোম ব্লাস্টের হাত থেকে বাঁচায় এই  
অফিসার । সেই থেকেই প্রেম কিন্তু পরিণয় হয়নি ।

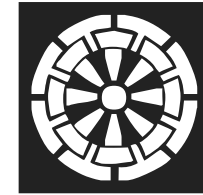
ওর স্ত্রী রত্নাবলী ওকে ডাইভোর্স দিতে চায়নি ।

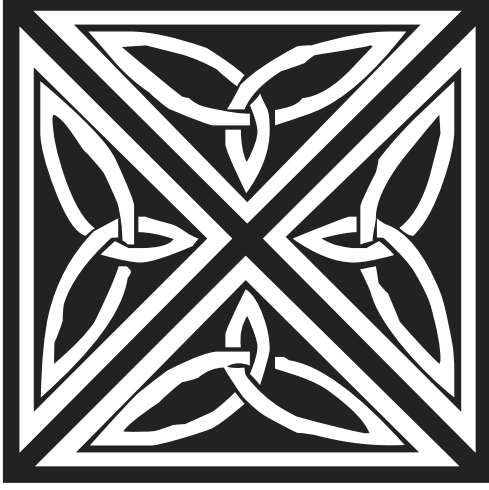
দিলেই কি বিয়ে হত ? মনে হয়না । কারণ মন্দিরা এমন কাউকে  
বিয়ে করবে ভেবেছিলো কৈশোর থেকে ; যার রক্ত নীল ।

কারণ প্রেম ফ্রেম অনেকের সাথেই করা চলে , কিন্তু বিয়ে

অনেক পবিত্র ও সিরিয়াস জিনিস ।

বিয়ে করতে হয় সমান সমান ঘরে, নাহলে ডাইভোর্স হবেই ।





## ষাড

মুন্সাইয়ের উল্লাসনগরে থাকে বিজন মল্লিক । বহুদিন বিদেশে ছিলো । যৌবনেই চলে আসে দেশে ; এক মেম-বৌ সঙ্গে নিয়ে । বৌয়ের নামকরণ করে সিদ্ধা । ওর আসল নাম ছিলো পলি তাই শর্টে সবাই পলি বলেই ডাকতো । পলি ভারতে গিয়ে পুরো ভারতীয় হয়ে ওঠে । সন্ধ্যায় ঘরে ধূপধুনো দেওয়া থেকে শুরু করে মাছের ঝোল আর ঝিঙে পোস্ত রান্না করা- সবই শিখে নিয়েছিলো ।

বিজন, কোর্টে কোর্টে গিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতো । ওর নিপুন কাজের জন্য বেশ নামডাক হয় । সবাই ওকেই সাক্ষী হিসেবে ডাকে । জাজও জানতেন যে বিজন যখন কাঠগড়ায় তখন কারো না কারো বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে এসেছে জেনেশুনে ; অর্থের বিনিময়ে ।

বাইরে, জাজের সাথেও কথাবার্তা হত । রীতিমতন মিনি সেলিব্রিটি , সাহেবি ইংলিশ বলা , চুরুট মুখে দেওয়া বিজন ।

ওর স্ত্রী, গৃহকর্মে নিপুণা হলেও চাকরি করতো এক শপিং মলের সেলস্‌ম্যান হিসেবে । এই মলে সন্ধ্যায় সব জিনিসপত্র পাওয়া যায় , বাস্কে । কফি--একইসাথে ৬টা, আচার দশ বোতল এইরকম আর কি । সেখানে কাজ করে মন্দ আয় করতো না এই মেমসাহেব । হাতে কাঁচের চুড়ি আর কপালে বিলি !

দুই সন্তানকে ভালোভাবে মানুষ করার চেষ্টা করছে। ইংলিশ স্কুলে দিয়েছে। তারা, ক্লাসে প্রথম পাঁচজনের মধ্যেই থাকে।

একদিন এক উকিল, ওদের বাড়িতে খেতে আসে। এসে কৌতুহলবশত: ওর স্ত্রী পলিকে, জিজ্ঞেস করে বসে যে সে জেনে শুনে কেন তার স্বামীকে এই মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার কাজ করতে দিচ্ছে!

উত্তরে স্নিন্ধা বলে ওঠে :: বিদেশে ও কী করতো জানো? বুল ফাইটিং! নিজেকে পুরুষালি করে, নিজের বীরত্ব ও বল দেখানোর জন্য পাগলা যাড়ের সাথে লড়তো।

**অসম্ভব হিংস্র, পাগলা যাড় খেয়ে আসতো ওর দিকে।**

মাঠে পরীক্ষা করা হত কোন যাড়ের সবচেয়ে বেশি হিংস্রতা। তারপর তাকে খেলায় নামানো হত। আমি ভয়ে কাঁপতাম। ওকে বললে ও গ্রাহ্য করতো না মোটেই। ও বলে, ছেলেদের ম্যানলি হওয়াই কাম্য। যেই পুরুষ কোমড় ব্যাথায় ভোগে আর ভয়ে কাঁপে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা উচিত! মেল ইগোর আরেকভাবে প্রকাশ হল তার দৈহিক বল। সেটা তার আরেকধরনের ইজ্জৎ এর ব্যাপার। যেমন মেয়ে বলতে সাধারণত: লোকে কোমল এক চেতনার কথা ভাবে, কুস্তিগীরের স্বপ্ন দেখেনা যে আঙুল মট্‌মট্‌ করে ভাঙবে, আঙুলগুলি পদ্মকলির মতন নরম হবে সেরকমই পুরুষ মানেই বলবান কেউ। নারকেল গাছের মতন কথায় কথায় নুইয়ে পড়বে না, এ হে হে! হে হে এরকম করে।

। কাজেই এখন ও হয়ত মিথ্যে সাক্ষী দেয় কিন্তু যাড়ের সাথে লড়াই করেনা বলে প্রাণভয় থাকেনা। এতে হয়ত মান যেতে পারে; হয়ত জরিমানাও হতে পারে কিন্তু জীবন জুয়ায় নামতে হয়না বলেই রক্ষে!

## জংলী

ঘন বনের ধারে; একটি চিতাবাঘের বাচ্চা পড়েছিলো অনেক অনেক দিন। শেষদিকে না খেয়ে খেয়ে ওর হাড়গুলি বেরিয়ে পড়ে।

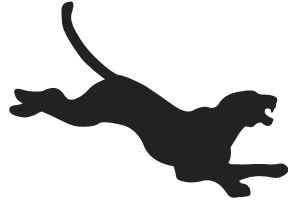
বনপথে- পথিকেরা ও মোটরগাড়ির যাত্রীরা, দিনের পর দিন ওকে দেখে দেখে অবশেষে বনবিভাগে খবর দেয়। বনবিভাগ ওকে তুলে নিয়ে যাবার আগেই এক ধনী ব্যবসাদার ওকে নিজের পোষ্য করে নিয়ে যায়।

আসলে-বনবিভাগই, চিড়িয়াখানা থেকে ওকে বনে ছেড়ে দিয়েছিলো। মুক্ত আকাশের নিচে বেড়ে উঠুক জংলী পশু! কিন্তু দুর্ভাগ্য চিতা শাবকের- কারণ বংশ পরম্পরায়, খাঁচায়

থাকা এই জন্তুটি ভুলে গিয়েছে শিকারের নিয়ম কানুন। ক্ষিপ্ততা ও হিংস্রতায় অনেক পেছনে সে এখন। তাই রিফ্লেক্স কমে যাওয়া এই শিশুটি অনাহারের কবলে পড়ে।

এক সভ্য পশু, যার পোশাকি নাম মানুষ--এসে এই অসভ্য, জংলী জানোয়ারকে খাবার যোগায়।

এই পশ্চার নাম সংবেদনশীলতা। এরই স্পর্শে বুঝি ধীরে ধীরে বন্য চিতা, জংলী থেকে ধীরস্থির ও অভিজাত হয়ে যায়।



## লাল গোলাপ

ঝিলমঝিলি ন্যাশেনাল পার্কের কাছেই মেটে পাহাড়ের সারি। সেই পাহাড় ভেদ করে গেলে এক গোলাপ বাগিচা- যেখানে সুগন্ধী ফুলের বাহার ও একটি লোকাল কাফে।

কাফের মালিক এক ভূটিয়া কাপেল। এইদেশে উদ্ভাস্ত হয়ে কাজের আশা নিয়ে এসেছিলো, এখন কাফে চালায়। আগে হিমালয়ের রিফিউজি ক্যাম্পে ওদের বাবা, মা, ঠাকুমা ইত্যাদি কুড়ি বছর কাটায়। পরে ওকে ঘাড়ে নিয়ে হেঁটে, লম্বা সফর করে তারপর জিপ ও তারও পরে মিলিটারি ট্রাকে করে বিমান বন্দরে গিয়ে স্পেশাল বিমানে করে বিদেশে আসে।

ওরা খুবই ছোট্ট একটি কমিউনিটি বলে ওদের তাড়িয়ে দেয় ওদের দেশ থেকে, অন্য কোনো কমিউনিটি। কিরাং নামক এই লোকটি বিদেশে এসে প্রচুর সংগ্রাম করে। ভাষা ছিলো সবচেয়ে বড় সমস্যা। সাইন ল্যাংগুয়েজে কথা হত। আরো বড় সমস্যা হল ওরা দেশে থাকতে ফার্মের কাজ করতো। ভুট্টা, ধান ইত্যাদি ফসল ফলাতো বলে এখানেও ওদের সেই কাজই দেওয়া হয় কিন্তু উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হওয়ায় ওদের ভারি অসুবিধে হত।

কাজেই ধীরে ধীরে ওরা ফুল চাষের দিকে চলে আসে । সঙ্গে কাফে । বাবা ও মা এখন অবসর জীবন কাটায় । ঠাকুমা স্বর্গে গেছেন ।

**এই কাফের নাম ::হেমলাল জিন্‌পা ।**

এখানে ভাড়া, গরু, শূকর, ইয়াক মান চমরি গাই ও মূর্গি সহ পাঁঠা ও হরিণের মাংসও পাওয়া যায় । রেড রাইসের পোলাউ ও স্যালাড, ভুট্টার বড়া আরো অনেক কিছু মেলে ।

পাশেই ওদের গোলাপ বাগান । সুন্দর গন্ধে মোঁ মোঁ করে রেস্তোরাঁ ।

এখানেই নিয়মিত খেতে আসে সোহিনী দেববর্মা ।

মাত্র আঠারোতে সে চাকরি জগতে ঢোকে । বারো ক্লাস পাশ করেই কম্পিউটার শিখে নিয়ে সে একটি ট্র্যাভেল এজেন্সিতে ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের কাজ নেয় । ১৯৯০ সালে সে তিন হাজার টাকা মাইনেতে কাজ করতো । মন্দ নয় ।

পরে ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে বি-এ পাশ করে । একটা গ্র্যাজুয়েশান না করলেই নয় তাই । পদোন্নতির জন্যেও লাগে তো তাই । আসলে সে কৈশোর থেকেই স্থির করেছিলো যে কোনোদিন কারো মুখাপেক্ষী হয়ে বাঁচবে না তাই চাকরির বাজার মন্দা দেখে এই রাস্তা বাছে ।

অপরূপা না হলেও সোহিনীর মুখটা ল্যাপা পোছার মধ্যে মিষ্টত্বে ভরপুর ছিলো । পানপাতার মতন মুখের গড়ণ আর পাকা গমের মতন রং তাই বুঝি নন -গ্র্যাজুয়েট হওয়া সত্ত্বেও ওর বিয়ে হয়ে গেলো মাত্র ২১ বছর বয়সে এক প্রবাসের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে । পারিবারিক যোগ ছিলো ।

সোহিনীর বাবা এক সফল সি-এ আর ওর মা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী । কাজেই অসুবিধে হয়নি । ত্রিপুরার গ্রামে ওদের আদিবাড়ি ।

বিয়ের পরে বিদেশে এসে কম্পিউটার সংক্রান্ত ডিগ্রী বাড়ায় । কিন্তু ওর স্বামী ওকে, বিদেশের নাগরিকত্ব নিতে প্রথমে চাপ দেয় এবং স্বাধীনচেতা মেয়েটি রাজি না হলে দৈহিক অত্যাচার শুরু করে । মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার ও সন্তান না হওয়া নিয়ে গঞ্জনা সইতে না পেরে ও বিচ্ছেদের দিকে চলে যায় । বাবা ও মায়ের পূর্ণ সমর্থন নিয়েই বিচ্ছেদ হয় ।

ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে বি-এ পাশ করে সোহিনী এখন কাজ করে এক সংস্থায়, সিস্টেম ম্যানেজার হিসেবে । অনেক মাইনে পায় । দেখতে ভালো তাই ডেটিং এর আহ্বানও আসে অনেক ।

বহুদিন অবধি ও চুপ করেই ছিলো । কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতো । ইদানিং- এক অফানেজ থেকে নয় এক বান্ধবীর সন্তানকে দত্তক নিয়েছে ও । সেই বান্ধবী আবার উড়নচন্ডী স্বভাবের ।

তার মোট পাঁচটি সন্তান । দুইজোড়া যমজ । একজনকে সোহিনী দত্তক নিয়েছে । চারজন মানে যমজ জোড়া দুটি বাবা ও মায়ের

সাথে থাকে । একদম ছোটটিকে কোলে তুলে নিয়েছে সোহিনী দেববর্মা । ওর বাবুবীরা ভিয়েতনামী মানুষ । কাজেই শিশুটিকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে সে ওর নিজ সন্তান নয় ।

ওরই মতন ল্যাপাপোছা চেহারা তার । ক্ষুদে চোখ আর হলুদ বরণ ।

ওর স্বামী ছিলো বাঙালি । সৈকত বসুরায়চৌধুরী । সে বিদেশে এখন নিজ সি-এ ফার্ম খুলেছে । আর বিয়ে করেনি । কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে বলেও শোনেনি কমন ফ্রেন্ডের মাধ্যমে ।

সোহিনী সম্প্রতি ডেট করছে এক গায়ককে । নামী কেউ নয় । নানান ফাংশান ও ফিউনোরাল ইত্যাদিতে গান করে । লোকাল রেডিও আর্টিস্ট । নাম ডেনিস্ রোজ । লোকটি, আগে ড্রাগসের কবলে পড়ে অনেকদিন রিহাবেরে ছিলো । তখন এক সহচরীকে বিয়ে করে । পরে আলাদা হয়ে যায় । এখন সন্তানসহ সোহিনীকে নিয়ে আছে । শিশুটিকে নিজের সন্তানের মতন খাওয়ায়, ন্যাপি বদলায় ইত্যাদি ।

ডাইভোর্স হলেই ওরা বিয়ে করবে এমন ঠিক করেছে ।

ছুটিছাটায় এদিকে সেদিকে ঘুরতে যায় ।

বর্তমানে ডেনিস্ রোজ এক লোকাল হাসপাতালে আছে । কারণ ভুটিয়া গোলাপবাগের সুবাস নিতে গিয়ে আক্রান্ত হয় এক অপরিচিত মানুষের হাতে । তার মুখে ; টেবিল থেকে একটি ছুরি তুলে ঢুকিয়ে দেয় সেই অদ্ভুত লোকটি ।

আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে । যার জন্য সোহিনী কাউকে ডেট করেনি বহুদিন ।

পুলিশের মনে হচ্ছে যে নিজের প্রাক্তন স্ত্রী সোহিনীকে, অন্যের বাহুবন্ধনে দেখে সহ্য করতে না পেরে এগুলো করছে সৈকত । তা নাহলে কেন করবে? হিংসাই একমাত্র কারণ ।

সৈকত তো সাইকো নয় ! কাজ করে খায় । এমনিতে নর্মাল । কিন্তু সোহিনীকে কারো সাথে দেখলেই ওর মাথা গরম হয়ে যায় । ও ভুলে গেছে যে সোহিনী ওর স্ত্রী নেই আর ।

পুলিশ ওকে ওয়ার্নিং দিয়েছিলো । তবুও আবার একই কাণ্ড ঘটালো ।

যখন একসাথে ছিলো -তখন না রাতে বাড়ি ফিরতো, না বৌকে সময় দিতো । খালি কাজ আর মদ । একটা কোর্টের নির্দেশ হঠাৎ করে কেমন সব বদলে দিয়েছে দেখে হতবাক্ সোহিনী ।

এমন প্রেম আগে দেখালে বিচ্ছেদটাই হতনা যে ।

## ডল হাউজ

ওলিম্ দেশের মধ্যেই আছে শহর ফারলং । রাজধানী তাতারি থেকে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূরে এই শহর । শহরের একদম শেষপ্রান্তে আছে হাল্কা রাবার বন । সেই বনের শেষে একটি বিরাট মহল । লোকে বলে ডল হাউজ ।

আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে এই এলাকার রাজা , এক রাখালের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো ।

মেয়েটি সুরুপা , সরল ও কর্মঠ । সারাদিন ভ্যাড়া চড়িয়ে সায়াছে ওদের একজোট করে ঘরে ফিরতো । দিনের বেলায় গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে বসে মেয়েটি, সুরেলা একটি যন্ত্র বাজাতো ।

রাজকুমার অনেকদিন ধরে ওকে দেখছে । মনে একটা কোমল ভাব ছড়ায় ওকে দেখলে । মেয়েটি গ্রামীণ ও দরিদ্র হলেও কিছু একটা ছিলো ওর ব্যক্তিত্বে । একবার রাজকুমার ইচ্ছে করে নিজের হাত কেটে ওর সামনে যায় । ও দৌড়ে এসে নিজের পোশাকের কোণা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেয় । তার আগে লতাপাতা ঘষে দেয় । বলে ওঠে :: তোমাকে দেখে মনে হয় শহরের লোক । এইভাবে বনবাদারে ঘোরা তোমার কস্মো নয় ।

বরং ঘরে বসে আরাম করো । তোমার তো পয়সা আছে , আমার মতন সারাদিন বসে বসে পশুর খেয়াল রাখতে হয়না ।

**টিপিক্যাল ফেরি টেলের গল্প যেন ।**

ক্ষুদ্র রাজবংশ হলেও আভিজাত্য ও মান মর্যাদার কারণে এই মেয়ে যার নাম - বার্চ , তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে অক্ষম ছিলো রাজনন্দন । মানুষটি আর বিয়েই করলো না । বার্চের মতন সরল মেয়ে যে ওকে ভালোবাসবে আর ওর দেখভাল করবে তাকেই ওর চাই । কিন্তু বাস্তবজগতে দ্বিতীয় বার্চের সন্ধান পাওয়া গেলোনা । তখন তো ফেসবুক ছিলোনা কাজেই বার্চ , বৃক্ষ হয়েই থেকে গেলো । রাণী হবার সুযোগ পেলোনা ।

**এরপর নাকি রাজকুমারের কিঞ্চিৎ মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয় ।**

সারাটাদিন পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতো । যেখানে বার্চ ভ্যাড়া চড়াতো সেখানে । ইদানিং ওর রাখাল পিতা এই কাজ করতো । বার্চকে ওর বাবা ও মা ঘরবন্দী করে রেখেছিলো ও অন্য পাত্রের সন্ধান করছিলো রাজবাড়ির নির্দেশ অনুযায়ী !

**বার্চের বন্ধল পাবার আশায়, বনপথে ঘুরতো পাহাড়িয়া রাজকুমার । শেষে ঘরে বসে পুতুল সংগ্রহ করতো ।**

নানান দেশের অপরূপ পুতুল সব । পুরুষ পুতুলগুলো ক্লায়েস্ট আর পুতলি মানে মেয়ে পুতুলগুলো দেহপসারিনী । এইভাবে দিনরাত বসে বসে মানুষটি পুতুল খেলতো ।

শেষ অঙ্কে মেয়ে পুতুলগুলোকে টেনে, হিঁচড়ে খুলে ফেলতো।  
হাসতো, হা হা হা করে। মহল কাঁপিয়ে।

বলতো, দেখো অভিজাত মেয়েদের নমুনা। তবুও সহজ সরল  
মেয়েদের তোমরা বৌ করবে না।

বহর পাঁচেক বাদে ওকে শিকল বেঁধে রাখতে হত।

শেষে আত্মহত্যা করে।

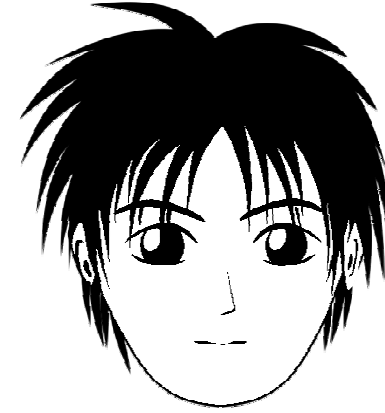
রাজ পরিবার পরে ঐ বাড়টাকে ডল হাউজ করে দেয়। সেখানে  
সব পুতুল সাজানো আছে। অরিজিন্যাল ডল আর তার সাথে  
কুমারের ছিঁড়ে ফেলা ডলের টুকরোগুলো।

জিয়াংসা, এইকথাটাই মনে হয় ডল হাউজ দেখলে।

-----ভাগ্য ভালো যে জ্যাস্ত পুতুলের ওপরে কোপ  
পড়েনি। অনেক টুরিস্টই ডল হাউজের কमेंট পত্রে  
লিখে রেখে গেছে।

সূর্যের আলো নেভার আগেই ডল হাউজ খালি হয়ে যায়।  
সমস্ত টুরিস্টকে বার করে দেওয়া হয়। তারপর সারাটা রাত  
চলে তান্ডব নৃত্য। পুতুলগুলো নাকি হাসে, কথা বলে,  
চলাফেরা করে।  
ওদের গণিকাবৃত্তিতে লাগিয়েছিলো রাজকুমার কিন্তু ওরা সরল  
পুতুলের দল সেজন্য সম্ভব হয় রাতভর অশ্রু বৃষ্টি নামায়।

পরদিন ভোরে পুরো ডল হাউজ অগোছালো হয়ে থাকে। আবার  
কেউ আসে, এসে সব গুছিয়ে তোলে টুরিস্ট আসার আগেই।





## মোহনায়

দীর্ঘদিন ইংল্যান্ডে কাজ করা চিকিৎসক মোহন ভার্গব স্থির করে যে জীবনের শেষপ্রান্তে মাতৃভূমে গিয়ে কাজ করবে।

কিছুটা ঋণ শোধ কিছুটা নিজস্ব ভালোলাগা।

অনলাইন বিজ্ঞাপন দেখে খুঁজে বার করলো একটি হাসপাতাল। সেখানে অভিজ্ঞ ডাক্তারের প্রয়োজন। সরকারি হাসপাতাল।

হিমালয়ের গহীন বনে এই হাসপাতাল। বৌদ্ধ্য গুম্ফা থেকে ক্রমে ক্রমে ভেসে আসে সুন্দর ঘন্টার আওয়াজ আর সংগীত।

সবুজ বনপথ বেয়ে, মঠের গা ঘেঁষে এই হাসপাতাল।

দিল্লী হয়ে আসে মোহন। হযত রিমোট জায়গা বলে চিকিৎসক পায়না সরকার। কেউ এলেও বেশিদিন থাকেনা।

সুন্দর প্রকৃতি আর শীতল আবহাওয়া হলেও অনেকেই লোকলস্কর, মেজাজি আড্ডা পছন্দ করে তাই হযত চিকিৎসকেরা পালিয়ে যায়। মোহনের সেই সমস্যা নেই। বিদেশে সে একাই দিন কাটাতো আর এখন এত বয়স হয়ে গেছে যে আর লোকজন ভালোলাগেনা। একাই বেশ থাকে।

চিরটাকাল অসম্ভব ব্যস্তজীবন কাটানো এই ডাক্তার এখন সাপলুডো খেলে আর ইন্সটাগ্রামিং করে করে দিন কাটায়। এই পাহাড়িয়া রাজ্যের ফটো তুলে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে। সম্প্রতি যা নিয়ে কলকাতায় এক প্রদর্শনী হয়েছে।

**মাঝে মাঝে ট্রেক করতে বেরিয়ে পড়ে।**

গরম চায়ের সুবাস আর কড়কড়ে টোস্ট খেয়ে শুরু হয় পথচলা। শেষ হয় লোকাল কোনো লোকের বাড়ি।

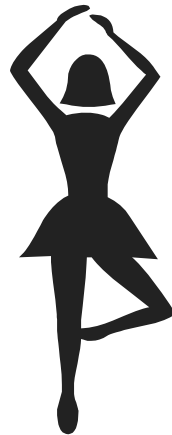
এই এলাকায় মানুষ সবজায়গায় পায়ে হেঁটে হেঁটে যায়। শিশু, কিশোর থেকে শুরু করে বৃদ্ধরা অবধি। এখানে মানুষের গড় আয়ু ১২০ বছর। ৬০ বছরের পরেও লোকে মা হয়। এবং ক্যান্সার ও এইডস নেই এই এলাকায়।

শুদ্ধ বাতাস আর অটেল, সতেজ খাদ্যকণা ও সবজির কারণে রোগভোগ নেই। খাঁটি দুধ খায় লোকে। সবাই নিরামিষ খায়। অনেক ফল খায়। কোনো কেমিক্যালের ব্যাপার নেই। **হিমবাহের জলে স্নান ও সেই জলপান, স্ট্রেস ফ্রি হয়ে হাসি হাসি মুখ করে থাকা সবসময় ঠিক যেন আদিম কোনো রাজ্য!**

আর মেয়েরা অপরূপা। কোথায় লাগে মিস্ বা মিসেস্ ইউনিভার্স! বৃদ্ধদের চামড়াও মসৃণ, কোনো ক্রিম ছাড়াই। আপেল গাল আর স্ট্রবেরি রাঙা ঠোঁট!

এত স্বাস্থ্যকর জায়গা বলেই বুঝি কোনো চিকিৎসকের দরকার হয়না । তাই ডাক্তারেরা সহজেই বোর হয়ে যায় । কাজের অভাবে । পালিয়েই যায় শেষমেশ ।

পালানোর কারণটা মোহন ; মোহনায় এসেই বুঝেছে ।



### **Information ::**

### **The Hunza people live till 120, give birth at 65 and laugh a lot!**

The members of the Hunza Community, consisting of 87,000 people live in the mountains of northern Pakistan with an average life-span of about 120 years. In some rare cases they even live until the age of 160, often without experiencing problems for the first 120 years. In fact, Said Abdul Mobudu, a member of the Hunza community confused immigration officers in London a few years ago because his passport stated his birth year as 1832.

The history of these people is even more fascinating. The Hunzas claim to be the descendants of Alexander the Great. Their community came into being at the time of the conquest, as they settled into the village and consequently married among themselves.

**<http://www.australiannationalreview.com/hunza-people-live-120-give-birth-65-laugh-lot/>**

## হাফ্ -ফিউনোরাল

প্রেমের শেষকৃত্য হয় আগে জানতাম না। আমরা ভারতের লোকেরা অনেক কিছুই জানিনা, বুঝিনা। শিখি আর তারপর আত্মস্থ করি। এরমকই এক ঘটনা ঘটলো আমার জীবনে। পড়শী পেগি জন্সটন্ খুবই দয়ালু। আমার অপারেশনের সময় আমার স্বামীকে ডিনার রান্না করে দিয়েছে। ওদের দুই সন্তান আমার স্বামী প্রতীককে সঙ্গ দিয়েছে। শিশু সঙ্গ মানে সরলতা, স্ট্রেস ফ্রি হওয়া।

সেই পেগিই ওর প্রেমের শেষকৃত্য করছে। প্রেমকে কবর দেবে। কারণ ওর পার্টনার মানে সাথী ওকে ফেলে চলে গেছে। অন্য মহিলার বাহুবন্ধনে। সেই প্রেমিকা খুবই ধনী। তাই পেগির সাথী, খুব কম বয়সেই অবসর নিতে সক্ষম হবে, চাকরি থেকে আর লাইফকে এনজয় করবে তারপরে। পেগি Canopy research করে তাই ওর বেশি পয়সা নেই। রোজগার কম।

আর ওর পার্টনার একটু ছদ্মবেশ আর খরুচে। তাই ওকে ছেড়ে চলে গেছে নতুন বৌ লিরিলের কাছে। লিরিল একটি ক্যাসিনো চালায় যার অনেক শাখাপ্রশাখা। ওর নাকি এত পয়সা যে ও নিজেও তার হিসেব রাখতে পারেনা। একটা হাত অর্ধেক আছে সেই জাদুকরী মেয়েটির!

পেগির প্রাক্তন প্রেমিকের মতন লোকেরা এখানে শ্যালো লোক বলা হয়। গভীরতা কম আরকি! সমাজে অটেল ছাড়া কিন্তু মানবিকতার ব্যাপারও থাকে। তাই ওরা গভীরতাকে আঁকড়ে থাকে। ওদের রক্ষাকবচ এটাই। গভীরতাই ওদের সমাজকে জীবিত রেখেছে!

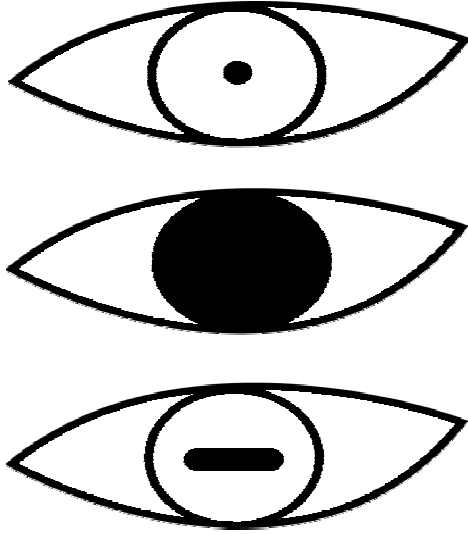
হয়ত কোনো কারণে জাদুকরীর হাফ্ হাত কাটা পড়েছে। তাতে কি? জীবনটাকে আমরা টানটান করে রাখতে ইচ্ছুক কিন্তু বাস্তবে তো তা হবার নয় তাই এখানে সেখানে কুঁচকে যায় নিয়ম করেই- আর আমরা সেই কুঞ্চিত অংশ ইন্ড্র করতে সদাব্যস্ত।

হাতের সাথে বিয়ের সোজাসুজি তো কোনো সম্পর্ক নেই বিশেষ করে বিদেশের মতন প্রযুক্তিগত সুবিধার দেশে! কথায় বলে পূর্ব দিয়েছে দর্শন আর পশ্চিম, প্রযুক্তি।

**কাজেই পেগি ওর হাফ্ মৃত্যু মানে প্রেমের অর্ধ ফিউনোরাল করছে।**

ব্যান্ড বাজিয়ে দুঃখের গান শোনালো লোকেরা। পেগিকে কালো পোশাকে মানে মৃত্যুর পোশাকে সাজানো হল। আর সিম্প্যাথি খাদ্যে সজ্জিত ছিলো টেবিল। ডিমের ওমলেট, পালং আর চিকেনের স্যালাড, হরেক রকমের **ফিউনোরাল আলুর ডিশ** আর নানান স্যুপের কারিকুরি। শেষে ব্রাউন কেক আর চকোলেট পুডিং।

মন্দ নয়; হাফ্ সরি ফুল গার্লফ্রেন্ড দ্বারা কৃত, হারানো প্রেমের হাফ্ ফিউনোরাল।



## শিখর

একটি বড় বাগান আছে শিখর লোধের বাড়ি। আসলে ভদ্রলোক বিয়ে, অন্নপ্রাশন ইত্যাদির সময় ডেকোরেটরের কাজ করেন। তাই নিজের বাগানটা অপরূপ ভাবে সাজিয়ে রেখেছেন।

**লোকে দেখতে যায়।**

শিখর নানান রাজ্য ঘুরে; নতুন নতুন ডেকোরেশানের আইডিয়া নিয়ে বিয়ে বাড়ি সাজান। বাঙালী আপ্পনার বদলে রঙ্গোলি, দক্ষিণীদের পুষ্পসজ্জা, রাজস্থানি ও গুজরাটি মানুষের নানান সজ্জার সমস্ত নজির পাওয়া যায় ওর ডেকোরেশানে।

শকুন্তলা হাবিবের, ওর বাড়ি যাবার কারণও এটাই। কোথায় শিখলেন এইসব??

ভদ্রলোক জানালেন যে উনি পড়েছেন অঙ্ক নিয়ে। অঙ্ককে আর্টস্, সায়েন্স কিংবা কমার্স কোনোটাই বলা যায়না।

সবকিছুতেই অঙ্ক লাগে। রোজকার টাকার হিসেব, জিনিস গোনা সবই অঙ্ক। ইতিহাসে সালের হিসেব, অর্থনীতিতে অঙ্ক এবং কম্পিউটার গ্রাফিক্স হল অঙ্ক দিয়ে সৃষ্ট শিল্প।

কাজেই নিজেকে উনি অঙ্কপাগলা মানুষ বলেন।

### ওঁর জীবন জলছবি চমকপ্রদ !

অঙ্ক নিয়ে পড়ার পরে লোন শোধের জন্য, লটারির টিকিট কিনতেন । মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষই বেশি এগুলি কেনে ভাগ্যের আশায় । তখন উনি একটি ফর্মুলা আবিষ্কার করেন যা দিয়ে খেললে টিকিটের নম্বর মিলে যাবে ।

এই লটারি নিয়ে ; মানুষকে শেখানোর জন্য একটি ট্রেনিং সংস্থা শুরু করেন । অনেক মানুষ লটারি পেয়েও যায় ।

পরে বিক্রি করে দেন ।

সেই টাকা দিয়ে কিছুদিন আনন্দ ফুঁটি করে কাটান নিজের গ্রামে । সেখানেও চমক । গ্রামের গহীন বনে নাকি পূর্ণিমা রাতে কে ঘুঙুর পরে ঘোরে তাই লোকে ঐপথে যাওয়া বন্ধই করে দেয় ।

আসলে ঘুঙুর পরে ঘোরে এক গ্রামীণ মেয়েই । তবে সে মানুষ । প্রেতাআ নয় । **সেটা বার করেন শিখর লোধ !**

সন্দেহ আগেই হয় । পরে বুদ্ধি করে একটি অসম্ভব পাওয়ারফুল চুম্বক নিয়ে উনিও গহীন বনের ধারে , প্রেতের গতিপথের কাছে

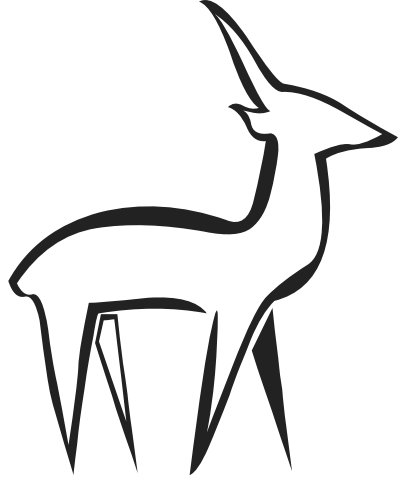
লুকিয়ে ফিল্ম করে আসেন । প্রচন্ড শক্তিমান এই চুম্বক নিমেয়ে সেই ঘুঙুর টেনে নেয় । চুম্বকে পা আটকে চিৎকার করতে শুরু করে মানুষী দেবী খান । নাম - দেবী হলেও সে কুকর্ম চক্রের সাথে জড়িত ছিলো । ওর স্বামী খানসাহেব , সেই চক্রের পাশা। স্মাগলিং এর চক্রে ওরা জড়িয়ে ।

বর্ডার পার করে, বিদেশী জিনিস এনে দুনস্বরী উপায়ে বিক্রি করতো ওরা । রাতেই কাজ বাড়তো । হয়ত পূর্ণিমা বলে কম আলোতে কাজ হয়ে যেতো , জ্বালানির খরচ বেচে যেতো ।

**লোকেও ভয়াল ভূমি ভেবে সবসময় এড়িয়ে চলতো । পূর্ণিমা কেন অমাবস্যাতেও । মাসের প্রতিটি দিনই ।**

শিখর লোধের বুদ্ধির তারিফ না করে পারেনা শকুন্তলা হাবিব - --তাই মিষ্টি হেসে বলে ওঠে , আপনি কেবল আর্টস মানে ফুলে বা ডেকোরেশানে নন আছেন কর্মাস ও লজিকেও !

সার্থক আপনার অঙ্ক শিক্ষা । সত্যি, আপনিই হলেন উপযুক্ত অঙ্কপাগলা শিল্পী ব্যবসাদার ! তাই সবকিছুর শিখর কেবল **আপনার মতন নম্বর ওয়ান মানুষদেরই জন্য!**



## ক্রিটিক

নামী কবি পুলক দশগুপ্ত ও নব কবি মল্লিকা করের দুটি বই এসেছে রিভিইয়ের জন্যে বাজার-সদানন্দের দপ্তরে। করবেন নামী ক্রিটিক সত্যানন্দ বোস। কবি সমুদ্র বোসের দাদা। তাই একটু দেমাকও বেশি বুড়োর, নিজেকে কি যে ভাবে! বই দুটির রিভিউ লেখার সময় পুলকের বইয়ের খুব প্রশংসা করলেন আর মল্লিকার বইয়ের নিন্দা। পরে পুলকের চিঠি পেলেন। কড়া ভাষায়।

সত্ব, আদতে বই দুটি আমি পাল্টে দিয়েছিলাম। মল্লিকার বইটি আমার আর আমার বইটি ওর লেখা। তুমি কেবল নামটি দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওর লেখা সম্পর্কে যা তা লিখেছো। ক্রিটিকের কাজ সৃষ্টিকে এমনভাবে দেখা ও সমালোচনা করা যাতে করে স্রষ্টা আরো নিপুন ভাবে সৃষ্টি করতে পারেন। সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হন। তুমি তো ভাই গায়ের ঝাল ঝেড়েছো মনে হচ্ছে!

রূপকার রূপ দেবার পরে তাই নিয়ে সমালোচনা করা খুব সহজ, রূপ দেওয়াটা কঠিন তাই না? সৃষ্টির ব্যাখ্যাটা লেখক/কবিরাই বোঝেন। তাই তাঁরা মায়াবী হন। তোমরা কসাইদের মতন। শুধু মাংস কাটতে পারো। কিন্তু জীবটার প্রতিও একটু দয়া মায়া রেখো।

লজ্জিত সত্যানন্দ ক্ষমা চওয়ার স্পর্ধাও দেখালেন না আর এরপর ।

পর্দার ওপাড়ে বসে তরুণী কবি ঠোঁটকাটা এন আর আই মল্লিকা বললেন : ক্রিটিক নাম পাণ্টে এগুলোর নাম দেওয়া উচিৎ কিক - কিক দেয়ার egoist butt .....

## খুনি মা

থোকাকে ধরেছিলো কাল । বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অপরাধে । ও নাকি মাওবাদী গ্রুপে । ঝাড়গ্রামের দিকে কোনো অরণ্যে লুকিয়ে ছিলো । ওর বক্তব্য - ওদিকে পিকনিকে গিয়েছিলো । সেখানে এই আগ্নেয়াস্ত্র কুড়িয়ে পায় । পুলিশ নিতে এলে মা কিছুতেই ছেলেকে নিয়ে যেতে দেন না । বাধা দেন । আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন : ওর বন্দুক থেকে একটিও গুলি বার হয়নি যা দিয়ে মানুষ মারা গেছে । আমাকে নিয়ে চলুন । আমি খুনি । আমি সাত আটটি প্রাণ নিয়েছি । পর পর ।

পুলিশ হতবাক । মুখ চাওয়া চাওয়া করছে ।

জানা গেলো মহিলা গাইনোকোলজিস্ট । পর পর তিন মেয়ে হবার পর এই ছেলে । সে জন্মায় দশ বছর পর । যতদিন না এ জন্মায় মহিলা অ্যাবর্ট করাতেই থাকেন বাচ্চা । তখন জ্রণের লিঙ্গ নির্ণয় করা বেআইনি ছিলো না । উনি গর্ভপাত করান । কাজেই উনি খুনি । ওর মতে । অতএব পুত্র মুক্তি পাক । উনি যাবেন জেলে ।

মাযের বুক ভাঙা কান্না কি পুলিশের হৃদয় গলাতে  
পেরেছিলো ? জানা গেলো না । কারণ

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এসেছিলো । অসময়ের বৃষ্টি । আর  
বাজ- সেই সাথে পাল্লা দিয়ে ।

শেষ অঙ্ক তাই এত দূর থেকে দেখা গেলো না ।



## চা বাগানের মেয়ে

হাঁটু সমান চা বাগানের সমান্তরাল একটি পথ । লাল লাল  
পথ । মেঠো পথ ।

সেই পথ দিয়ে হেঁটে যায় এক মেয়ে , লাইলি । লাইলি চা  
বাগানে কাজ করে । দিনান্তে হাট থেকে সবজি ও  
আনাজপাতি কিনে ঘরের দাওয়ায় বসে রান্না করে ।  
তারপরে শুয়ে পড়ে কিন্তু আকাশে গোল চাঁদ উঠলে সে  
দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে ।

এই রঙিন দেখে আসছে বাদল । বাদল শর্মা । প্রফেশন্যাল  
ট্রিকার ।

বাদল ছিলো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু কাজের চাপে খুব  
কম বয়সে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে যখন দিশেহারা তখন  
একটি বাচ্চা ছেলের কথায় তার জীবন দর্শন বদলে যায় ।  
পাশের বাড়ির থোকা ঋদ্ধি বলে ওঠে :

মস্তি করো আঙ্কল , বেঁচে নাও এক বছরে শ বরষ , কে  
জানে কাল হো না হো !

সত্যি তো ! এইভাবে তো আগে ভেবে দেখেনি বাদল । তখন  
পত্রপাট চাকরি ছেড়ে ট্রিকিং এ ঢুকে পড়ে । আগে থেকেই



ট্রেকিং করতে। এবার তাতে প্রফেশন্যালিজম নিয়ে এলো। কাজেই কিছু টিভি চ্যানেল ওকে ভাড়া করলো। তারা ক্যামেরা নিয়ে ওর সঙ্গে যেতো। দুর্গম স্থানে ট্রেক করার ছবি তুলে টেলিকাস্ট করতো। বাদল পয়সা পেতো। ওর তাতেই চলে যেতো।

লাইলিকে একদিন সে জিজ্ঞেস করলো : হ্যাঁ রে তো মরোদ কৈ ?

লাইলি এড়িয়ে গেলো। আবার কিছুদিন পরে জিজ্ঞেস করতে বললো :

আমার মরোদ নাই। এক বন্ধু আছে সে আকাশে থাকে, মাঝে মাঝে এদিক পানে আসে। তুমি দেখে ওরে ?

লাইলি জাতে বাহে। উত্তরবঙ্গীয় মানুষ।

-তোর বন্ধুকে দেখা দেখি কেমন আকাশ পানে ধেয়ে যায়। কোথায় গেলে তাকে দেখা যাবে রে ?

এই ইখানে। ও পূর্ণিমা রাতে আসে। অন্য সময় আসেনা।

সেদিন লক্ষীপুজো। লাইলির বন্ধু আসবে। ভীষণ ব্যস্ত বাদল আজ। খুব তাড়াতাড়ি কতগুলো ছোট কাজ সেরে তৈরি হয়ে নিলো।

তারপরে লাইলির সঙ্গে হেঁটে চলে গেলো চা বাগানের সীমানা ছাড়িয়ে খোলামাঠে। সেখানে শুধুই ঘাস। আর দূরে দিগন্ত চাঁদের আলোয় থৈ থৈ করছে।

হুশ! একটা শব্দ। ওপরে চেয়ে দেখে একটি রূপার চাকতির কিছু উড়ে এসে নামলো মাঠে। তারপরে বীর দর্পে নেমে এলো এক যুবাপুরুষ। কিন্তু একি ?

এর দেখি দুটি পাখনা আছে। চোখ নাক মুখ সবই প্রায় মানুষের মতন। কথা বলছে অদ্ভুত ভাষায়। লাইলিও সেই ভাষায় কথা বলছে। জানা গেলো লোকটি একটি গ্রহ থেকে আসে সেই গ্রহের নাম টেটা। বহু আলোক বর্ষ দূরে সেই গ্রহ। সেখানে মানুষজন আগুনে পোড়েনা। অনেক অমিল আমাদের গ্রহের সঙ্গে তবে একটাই মিল। সেটা হল ওখানে চা বাগান আছে। পৃথিবীর যেই সব মানুষ চা প্রেমী তারা মারা গেলে টেটায় জন্ম নেয়। ও লাইলিকে টেটায় নিয়ে যাবে। সেখানে চা বাগানের কাজ করবে সে। তবে ওখানে যেতে গেলে তাকে অনেক হাল্কা হতে হবে। তাই সময় লাগছে। মজা লাগছে বাদলের। এরকম জীব সে জন্মেও দেখেনি।

সে চলে গেলো চুপিসারে, হুশ করে নয় একেবারেই। দূরে অস্তমিত তার রূপার চাকতির মতন বাহন। টেটায়ান। শেষ হল অভিযান।

-একটু স্বপ্ন, আমাদের জীবনে আর কী আছে বাবু ? আমরা স্বপ্ন নিয়ে বাঁচি।

বন্ধু স্বপ্ন ফেরি করে । আমি বিনা পয়সায় স্বপ্ন কিনি ।  
তারপর চাঁদের আলোয় স্বপ্ন দেখি , অন্য দুনিয়ার , উন্নত  
চা বাগান , কুলি কামিনের মারামারি নেই । মদ্যপান করে  
রক্তরক্তি নেই , বাবুদের চোখ রাঙানি নেই ---- আর  
সবুজ পৃথিবীর কোণে এই বাংলা , তার চা বাগানে আজ  
আগুন । শ্রমিক ছাঁটাই , মালিকের লোকসান । চা বাগান  
বন্ধ হবার মুখে । স্বপ্ন না দেখলে আমরা কি নিয়ে বাঁচবো  
বাবু মশাই , আমরা বাগানের ফুলকলিরা ?

বাদলের কল্পনাপ্রবণ মনে তখন টেটার চা বাগান : সবুজ  
গাছের বদলে স্বচ্ছ চা গাছ , পাতা : দুটি পাতা একটি কুঁড়ি  
। দূর থেকে মিহি গলায় কে যেন গেয়ে ওঠে এই পৃথিবীর  
গান : ফুলকলি রে ফুলকলি রে ফুলকলি রে ফুলকলি -  
---

কে গাইছে ? এ অন্য কোনো লাইলি নাকি ? যে আগেই স্বপ্ন  
কিনে পাড়ি দিয়েছে টেটায় ! বৈজ্ঞানিকেরা শুনছেন ??

## তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ও তারপর -

-----

সদ্য শেষ হল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ । সারা পৃথিবীতে কেউ  
জীবিত নেই । অন্তত: কাউকে আর দেখা যাবে না ।  
শূন্যতায় ভরা চরাচর । চারিদিকে নিঃশব্দতা । আণবিক  
ধোঁয়া চারিপাশে ।

সমস্ত ডিপ্লোম্যাচি যখন পরাজিত হল তখন জয় হল যুদ্ধের,  
বেজে উঠলো দামামা ।

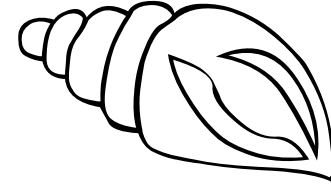
পৃথিবীর প্রথম সারির সমস্ত দেশের নেতারা একজোট হয়েও  
বন্ধ করতে পারলেন না যুদ্ধ ।

মার্কিন মূলুক থেকেই প্রথম শুরু হল হানা । ছোঁড়া হল  
বায়োলজিক্যাল ওয়েপস্ ও নিউক্লিয়ার বোমা । নিঃশেষ  
হয়ে গেলো সভ্যতা । কেউ কোথাও নেই । কান্নার শব্দও নেই  
বাতাসে । হিমেল হাওয়া হয়েছে প্রচণ্ড গরম । বাতাসে  
তেজস্ক্রিয়তার পরশ । বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের ফল । গরমে  
বড় বড় হিমবাহগুলিও যেন গলে গেছে । পাহাড়ের চূড়া  
বরফ মুক্ত । হঠাৎ মাটি ভেদ করে উঠে আসে এক বামন ,  
ছোটখাটো চেহারা । মাথায় বরফ , সাদা চুল । এত দুশ্বপ

সত্বেও সে বেঁচে আছে । আজ তার বন্ধু শুধুই একরাশ আরশোলা । তারাও তেজস্ক্রিয়তার শিকার কিন্তু বেঁচে আছে । বামণের পরণের পোশাক মলিন । অনেক দিন অভুক্ত । কিন্তু গন ইনথ দা উইন্ডের চরিত্রের মতন গোত্রাসে খাবার খুঁজে খাচ্ছে না । সে শুধুই কাঁদছে , আর কাঁদছে আর কাঁদছে । লেখিকা নীহারিকা ভ্রমণে যাওয়াতে প্রাণে বেঁচে গেছেন । ধীর পায়ে এগিয়ে যান ওর দিকে । হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে প্যারাডাইজ সার্কাসের ক্লাউন , মনসিজ বেরা । আর চীৎকার করে ছুটে যায় আকাশ তলে , একজন জ্যান্ত মানুষ দেখে পাগল হয়ে গেছে আর উন্মাদের মতন বলে চলেছে : প্যারাডাইজ লস্ট , আমি জানতাম এমন হবে একদিন। আমি জানতাম , কিন্তু তোমরা কেউ শুনলে না আমার কথা, কেউ শুনলে না । আমাকে সিরিয়াসলি নিলে না কেউ , আমি যে হাসি তামাশা করতাম তাই আমার কথাগুলোকেও তোমরা তামাশা ভেবেছো । দেখো জোকারেরাও সিরিয়াস হয় , তারাও কাঁদতে জানে কিন্তু কাঁদতে চায়না , সবাইকে হাসি মুখে দেখতে চায় তাই তো আমি সাবধান করেছিলাম , তোমরা শুনলে না , কেউ শুনলে না ।

তার করুণ শব্দমালা প্রতিধ্বনি আকারে ফিরে আসে লেখিকার কানে , বারবার ।

আজ লেখিকা ব্যতীত আর কেউ কিছু শোনার জন্য জীবিত নেই ।



## চোর

ধনবান গোস্বামীদের বাড়িতে চোর ধরা পড়েছে । ১৬ বছরের চাকর ফুৎসা । হতদরিদ্র পাহাড়ি ছেলেটি এসেছিলো কাজে শিলিগুড়ির এই বাড়িতে । লোভে পড়ে নিমন্ত্রিতদের জন্য তৈরি করা চিলি চিকেন খেয়ে ফেলেছিলো । ধরে ফেলে মালিকের ছেলে শোণক । গায়ে গরম শিকের ছাঁকা ও মারধোরের পরে শোণক বেরিয়ে গেলো । আজ ওর থিসিস জমা দেবার দিন । রাতে একটি ভোজ দিয়েছে সিনক্লেয়ার হোটেলে । ওর গাইডের সম্মানে । কারণ গবেষণাটি আদতে ওরই কাজ । নামটা শুধু শোণকের ।

## পেজ জিরো

নতুন একটি পাতা চালু হয়েছে সিনেমা কাগজে । পেজ জিরো । সাংবাদিক অহনা ঘোষাল ওখানে লেখে । খুব জনপ্রিয় । কোনোদিন কেউ ওকে সাংবাদিকতা করতে দেখেনি । বরং গল্পি বুড়ি । গল্পে পটু । আসলে ও নানান সেলিব্রিটিকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কেচ্ছা লিখে দেয় । বিভিন্ন গল্পের প্লটে ওদের ফেলে দেয় । নামগুলো বসালে মনে হয় সত্যি ঘটনা । এইভাবেই চলেছে । সম্প্রতি ডাক পেয়েছে আরো বড় গসিপ কলম থেকে । একটু উপস্থিত বুদ্ধি - স্বর্ণের সিঁড়ি অহনার হাতের মুঠোয় ।

## থ্রি ডি প্রেম

তুহিন প্রেমে পড়েছিলো মন্দিতার । একসাথে গিয়েছিলো  
মানস সরোবরে , তীরে ।

এতো কম বয়সে ?? আজকাল লোকে কম বয়সেই  
স্পিরিচুয়ালিটির দিকে যাচ্ছে ।

ভোগ লালসায় ক্লান্ত তুহিনের একই অবস্থা । মারা গেলো  
মন্দিতা তুষার ঝড়ে । তীরের পথে ।

ফিরে এসে ডিপ্রেশানে পড়ে তুহিন । শেষে এলো এক ফন্দি  
মাথায় ।

আজকাল সে মন্দিতাকে মিস করেনা একদম ।

নিজের ছিলো অ্যাড এজেন্সি । সেখানে লাগানো ছিলো থ্রি ডি  
ক্যামেরা ।

সেইখানে বসে একটি বিশেষ চশমা পরে নিলেই দেখা যায়  
মন্দিতাকে । আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় । কথা বলে । হাত  
নেড়ে ডাকে । ছুঁয়ে যায় । চুম্বু খায় ।

আসলে এগুলো সবই ওদের বহুদিন আগে থ্রি ডি ক্যামেরায়  
শুট করা ঘটনা ।

যা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির জন্য আজ মুঠো বন্দী । মন্দিতা  
জীবন্ত , সশরীরে হাজির -ক্যামেরার ফিল্ম ছেড়ে প্রেম  
রিয়ালিটিতে ।



## অ্যাক্সিডেন্ট

কফির শূন্য পেয়ালাটি সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো সুগত ।  
কাল ডেলিভারি দিয়ে দেবে বলেছে নতুন হন্ডা অ্যাকর্ড ।  
গাঢ় লাল রং । একেবারে হায়েস্ট লাক্সারি মডেলটা কিনেছে  
এবার । এই নিয়ে পাঁচবার হল । কখনো সিডনি কখনো  
ডারউইন কখনো বা নিউ ক্যাসেল ----- প্রতি শহরে  
একবার করে ।

চালকের সিটে বসে রেসিং কারের সুরক্ষা পোশাক ও  
হেলমেট পরে যাতে কলিশানে নিজের চোঁট না লাগে ।  
পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারে সজোরে অন্য গাড়ি কারণ  
সে নিজের গাড়িটিকে একটু স্লো করে দেয় । স্পিড লিমিট  
বঁধে দিয়েছে ৮০ অর্থাৎ ৮০-র রাস্তায় এগুলো করে । গাড়ি  
চুরমার । প্রতিবার । গাড়ির দুর্দশা দেখে প্রতিবারই সেটি  
রাইট অফ করে দেওয়া হত সেফটির কারণে তারপর  
ইন্সুরেন্স কোম্পানি থেকে টাকা আদায় । নতুন মডেলের  
গাড়ি কেনা । এইভাবে চলছিলো বেশ । এইদেশে এসে ।  
ভারতীয়রা যখন মারধোর খেতে আরম্ভ করলো তখন ভয়ে  
একদিন সোজা ভারতে ।

তাতে কি ? আগের সিন ::

সদ্য পাওয়া হন্ডা অ্যাকর্ড যার মূল্য ভারতীয় টাকায় প্রায়  
২৫ লাখ তো হাতে আছে , বিক্রি করে পাবে অনেক ডলার  
- নগদ । পারিবারিক পুরনো বি এম ডাবলুটা থেকে পাবে  
আরো লাখ খানেক ভারতীয় টাকা । লিভ ইন রিলেশানে  
থাকা ৭৫ উর্ধ্ব বৃদ্ধা ফিলিপার গাড়ি ওটি ও দুটো বাড়ি ,  
একটি সিডনিতে অন্যটি গ্রিফিথ বলে একটি ছোট শহরে ।  
দুটো বিক্রি করে দিয়েছে কারণ সম্প্রতি মারা গেছেন ফিলিপা  
, হৃদ যন্ত্রের বিকলতায় । হার্ট ফেল হয়েছে এই খবর শুনেই  
যে সুগত দুঃস্বপ্নরী করে । ওর কেউ নেই । ওয়ারিশ সুগত ।  
এখন দুই বাড়ি বিক্রির আরো টাকা নিয়ে ভারতে গিয়ে  
রাজার হালে থাকবে । সম্মানও পাবে যথেষ্ট - এখন তো  
সে এন আর আই -- নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান । চাট্টিখানি  
কথা ? কালাপানি পার হতে পারে কজনায় ? আর সে তো  
এসেছিলো পড়তে । কারো স্কল্কে আরোহণ করে নয় । সবাই  
জানে সে কথা । জানে- জানে । মেধাবী ছাত্র , আই আই টি  
, নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান-----ব্লাহ্ ব্লাহ্ ব্লাহ্ ।

## আত্মজীবনী

সুকেতু আত্মজীবনী লিখেছেন । উনি একজন নামী খেলোয়াড় । কত দারিদ্র্যের মোকাবিলা করে বড় হয়েছেন , কাদা জলে খেলেছেন সব লিখেছেন খোলা মনে । বাজারে খুব বিক্রি হয়েছে বই । সাড়া পড়ে গেছে চারিদিকে । কত তরুণ /তরুণী উৎসাহ পেয়েছে । বঙ্কু চিত্রগুপ্ত বললো : পুরোটাই তো মিথ্যে । এটা তোর আত্মজীবনী নয় । এতো আমার ।

হাসেন সুকেতু । বলেন : বাজারে যেটা খাবে সেটাই তো লিখবো । সত্য কথা লিখতে হবে এরকম কোনো অলিখিত নিয়ম আছে কি ? আর এতে ঢালাও পয়সা আসছে । আমি এখন ধনী ।

খেলেও এত পয়সা পাইনি যত আত্মজীবনী লিখে হয়েছে ।

## ঘুম

বাড়ির পোষা কুকুর সিজার ঘুমের মধ্যে হাঁটে । মানুষ ঘুমের মধ্যে হটন করে শুনেছিলাম । স্লিপ ওয়াকিং অথবা somnambulism যে জন্তুর-ও হয় জানতাম না । সিজার ঘুমের মধ্যে উঠে হেঁটে বেরিয়ে যায় আমার বাগানে । এখন গরমকাল তাই দরজা অল্প খুলেই আমি লাউজে শুয়ে থাকি । টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ি ।

আমার নাম বাসবদত্তা শেরিডান । স্বামী রয় শেরিডান মৃত তা প্রায় তিন বছর । এই বাড়িটা সদ্য কিনে উঠে এসেছি নতুন পাড়ায় । একা থাকার পক্ষে ভালই ।

পেছনে ছোট বাগিচা । সেখানে কমলালেবু , আপেল , ন্যাসপাতি গাছ আছে ।

তার পাশে আছে একটি ইটের উলুন । সেখানে ছুটিছাটায় বার্বিকিউ হয় ।

আমার ইয়ার দোস্ত আসে সুদূর থেকে । সবাই মিলে মস্তি হয় । আড্ডা , ঘরোয়া জলসা । মদিরা । ওরা চলে গেলে সিজার একমাত্র সঙ্গী । ও যেন মানুষ শুধু মুখে ভাষা নেই । অবশি ওর সাহচর্যে আমিও নীরবতার ভাষা শিখে গেছি ।

এক রাতে ঘুমের ঘোরে ও হেঁটে বাগানের দিকে যাবার পরে  
হঠাৎ ফিরে আসে মুখে একটি হাড় নিয়ে। ঘুমের ঘোরে  
আমি কিছু বুঝতে পারিনি। পরেরদিন সকালে দেখলাম  
একটি গর্ত খুঁড়ে ও আরো হাড় বার করেছে। ব্যাকহিয়ার্ডে  
এত হাড়? এই হাড় কার??

পুলিশে খবর গেলো। তদন্তের পরে জানা গেলো এক আজব  
কাহিনী।

মিস্টার ও মিসেস পাকড়াশী এসেছিলেন এই বিদেশে।  
পরবাসে জনসংখ্যা কম হওয়ায় বাচ্চা হলেই সরকার মোটা  
টাকা দিতো।

টাকার লোভে গোটা দশকে সন্তানের জন্ম দিয়ে অর্থ হস্তগত  
করে ওঁরা চার পাঁচটা বাচ্চাকে মেরে ব্যাকহিয়ার্ডে পুঁতে দেন  
। প্রতিবেশীদের বলেন : বাচ্চারা দেশে আছে দাদু ঠাকুমার  
কাছে।

লোকেরা সরল মনে বিশ্বাস করে।

তাদেরই হাড় খুঁজে পেয়েছে ঘুমের মধ্যে হাঁটা আজব  
সারমেয় সিজার।

সিজার এখন বিখ্যাত। উইকিপিডিয়াতে নাম উঠেছে ওর।  
শুধু গোয়েন্দা নয় একজন সাইকিক কুকুর হিসেবে।



## পাবলিশার

শ্রীমতী জুলি মুখোপাধ্যায় হঠাৎ-ই বাংলার অত্যন্ত  
নামকরা লেখিকা হয়ে উঠেছেন। যা লিখছেন তাই বেস্ট  
সেলার হয়ে যাচ্ছে। নিদ্রুকে বলছে : ধূস একি লেখা? কে  
কিনছে কে পড়ছে আর কি-ইবা পাচ্ছে এইসব রচনা পড়ে  
কে জানে।



জুলির তাপউত্তাপ নেই। ওর প্রোডাকশান খুব বেশি, ঝটি করে লিখে ফেলতে পারেন, পাতার পর পাতা নির্মান করে চলে। পেশায় ডাক্তার। যেটুকু সময় পান লেখালেখিতে কাটান। ঘর বন্দী হয়ে লেখেন। বলেন : আমি মানুষের কথা লিখি।

নিম্নকে বলে : লেখেন ভাটি -জাবর কাটেন। ফালতু রাইটার।

তবুও বই, বাজারে বেস্ট সেলার। পুরস্কার অবশ্যি এখনো জোটে। ওর প্রকাশক অর্থাৎ পাবলিশার মিস্টার বুনবুনওয়ালা পার্ভাট। বয়স ভালই হয়েছে। নারীসঙ্গ সবচে বেশি উপভোগ করেন। নতুন ফুলের নাম জুলি।

প্রতিভাবান ইজ্ঞাদার লেখিকার সুযোগ পান না :

প্রকাশক মশাই বলেন - প্রতিভা দিয়ে কিসু হয়না। বডি চাই বডি। আইস্বরইয়া, বিপা-সা কিংবা রাখী সাওয়ান্ত। উ-উম্ম --- যেন তন্দুরি চিকেন।

জুলির বডি আছে প্রতিভা নেই আপনাদের প্রতিভা আছে রূপ নেই, বডি নেই। বিছানায় পারফরমেন্স নেই। বেসিক মিশনারি পোজ ছাড়া কিছুই জানেন না। আরে এটা সেক্সের যুগ। কামকলা শিখুন, প্র্যাকটিশ করুন তবে তো বড় লেখিকা হবেন। বাবার সঙ্গে মেয়ের সেক্স, কুকুরের সঙ্গে বাড়ির শিশুর এইসব তো ডিটেলস নামাতে হবে -- এগুলো না লিখলে -হবে! ভারতেই তো লেখা হয়েছিলো

কামাসুত্রী আই মিন কামসুত্র! আপনারা বাঙালীরা সব ক্যাথা কে এরকম গোল গোল করে বলেন কেন ব্যালুন দেখি!

জুলির বই বেরোলেই প্রকাশক মশাই লোক লাগিয়ে সমস্ত বই কিনে নেন। বইগুলো অত্যন্ত কম দামে বাজারে ছাড়েন। এইভাবে জুলিকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন। এখন উনি বাম হস্তে আঁকিবুকি কাটেন আর লোকে কিনে নিয়ে যান শো-কেস সাজানোর জন্যে কিংবা কিছু আনপড লোক নিয়ে বাড়িতে রাখেন নিজেকে শিক্ষিত প্রমাণ করার নিমিত্তে। পাবলিশারের কুটিল মনের জটিল সমীকরণ জুলিকে করেছে বিশ্ববন্দিতা।

## এক্সপোর্ট কোয়ালিটি

ঈশ্বিকা যখন বিদেশে থাকতেন না তখন ভারতে বেশ কিছু ব্যবসায়ীকে চিনতেন যাঁরা পেজ থ্রী সার্কেলে বিশেষ বন্দিত , তাঁদের কমোডিটি বিদেশে রপ্তানি করেন বলে । বেশ সম্মানিত মানুষ সোসাইটি সার্কেলে ।

-আরে উনি মিস্টার ধানোজা --বিদেশে ড্রেস মেটেরিয়াল এক্সপোর্ট করেন !

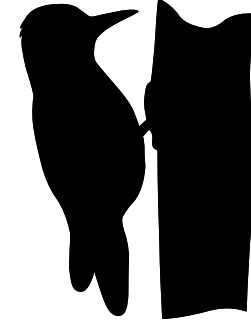
-ওহ্ হো ! উনি ড: তলিস্তান । ম্যানেজমেন্টে পি এইচ ডি । উনি বিদেশে বাসন পত্র রপ্তানি করেন । বিরাট ব্যবসা ! একটিবার মিটিং করতে গেলে ৬ মাস আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয় !

ঈশ্বিকা বেশ গর্বিত বিদেশে এসে ওঁনাদের জন্যে ।

একদিন সকালে একটি দোকানে গিয়ে দেখেন ওঁদেরই সমস্ত প্রোডাক্টে দোকানটি সুসজ্জিত । কিন্তু একি ! গর্বে বুক ফোলার বদলে মুখ হয়ে গেলো পানসে ।

দোকানটির নাম : দা রিজেক্ট শপ ।

অত্যন্ত সম্ভ্রায় দুনিয়ার রিজেক্টেড মাল এই দোকানে কিনতে পাওয়া যায় কারণ এইসব জিনিস বিদেশের কোয়ালিটি কন্ট্রোল পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি ।



## কমিউনিজম

রাণীপুর নাম হলেও এই রাজ্যে কমিউনিষ্ট সরকার পাক্কা ৩০ বছর রাজত্ব করছেন । জনগণের স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই । যাঁরা ওদের তাঁবেদারি করেন তাঁরা

সমাজের শিখরে অন্যরা দলিত । ডাউন্ট্রিডেন মানুষ  
হয়েছেন আরো গরীব ।

তাদের হয়ে গলা ফাটিবার কেউ নেই । নেতারা ফুল ফেঁপে  
উঠেছেন ।

সব থেকে বড় কথা হল এই রাজ্যে কেউ বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে  
কথা বললেই তাঁকে জেলে পুরে দেওয়া হয় । তন্ত্র মন্ত্র পূজা  
পাঠ সব গেছে গোল্লায় ।

তান্ত্রিক ও সাধুরা লুকিয়ে থাকেন অথবা অন্য রাজ্যে চলে  
গেছেন ।

সবাই সায়াণ্টিফিক মাইন্ডের মানুষ । বিজ্ঞান সস্মত উপায়ে  
রাজ্যে শাসন করেন ।

এই রাণীপুরে এক দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যাল ছিলো । আজিজ খান ।  
লোকে বলে কমিউনিস্টদের পোষা গুন্ডা । বহু মানুষ  
মেরেছে । বহু অপরাধের সাক্ষী ।

আজিজ খানের এনকাউন্টার করেছেন এক পুলিশ  
অফিসার । কমিউনিস্ট সরকারের নির্দেশে কারণ সে ওঁদের  
গলার কাঁটা হয়ে উঠেছিলো । ফ্ল্যাক্সেস্টাইন হয়ে উঠেছিলো ।  
মারা যাবার পরে তার দেহাংশ একটি ঘটিতে পুরে রাখা  
হয়েছিলো এক পরিত্যক্ত গুস্তাফ । কমিউনিস্টদের কাছে যা  
ট্রিগ্গার স্পট । বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আগেই মেরে তড়ানো  
হয়েছে । এখন এখানে লোকে বেড়াতে আসেন । একবার  
একটি শিশু কোনোভাবে ঐ ঘড়া খুঁজে বার করে ও দেহাংশ

ছড়িয়ে ফেলে মাটিতে । তারপর শুরু হয় ভয়ানক খুন  
খারাপি , রাজ্যে জুড়ে যার কোনো কিনারা পুলিশ করতে  
পারেনি । অশরীরি খুনি একের পর এক মেরে চলে মানুষ ।  
কখনো নেতা কখনো মন্ত্রী কখনো বা বিজ্ঞানী । বিজ্ঞান  
লুটাম্বে ভুমিতে । কেউ কিছু করতে পারছেন না । হয়ত  
পারতেন কোনো তান্ত্রিক কিংবা ধর্মগুরু । কিন্তু আজ তাঁরা  
কেউ নেই । সরকারের ভয়ে বহুদিন যাবৎ-ই রাজ্য ছাড়া ।

## সুভদ্রা

সুভদ্রা উত্তরবঙ্গের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছে ছিল নিজে শহরে থাকতে পারেনি তাই সন্তানদের বড় জায়গায় রেখে মানুষ করবে। হল সেরকমই। বিয়ে হল এক প্রযুক্তিবিদের সঙ্গে। স্বামী পাড়ি দিল এক বিখ্যাত মরুশহরে। সেখানে গার্বেজ দিয়ে একটি অপূর্ব ও পূর্ণ রিসর্ট তৈরি করে বেশ নাম করলো। সন্তানকে পড়তে পাঠালো লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে। আপাত দৃষ্টিতে প্রযুক্তিবিদ হলেও সুভদ্রার স্বামী পল্লব ছিলো এক সিক্রেট এজেন্ট। উগ্রপন্থার সঙ্গে জড়িত মানুষকে আইডেনটিফাই করতো সে। এক বড় উগ্রপন্থীকে, সরকারের ওপরে সেই সংগঠনের চাপে ছেড়ে দিতে হয়। তারা মন্ত্রীর মেয়েকে কিডন্যাপ করেছিলো। উগ্রপন্থীকে ছেড়ে দেবার সময় সেই টিমে ছিলো পল্লব। জনগণ ক্ষেপে উঠেছিল সরকারের ওপরে। কিছুদিন পরেই উগ্রপন্থী মারা যায়।

উগ্রপন্থী দলের রোষে অথৈ জলে পড়ে গৃহবধু সুভদ্রা। পল্লব হঠাৎ-ই একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায়। কী করে সন্তানের শিক্ষার খরচ জোগাড় করবে তাই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে করতে রাতারাতি মাথার অর্ধেক চুল সাদা হয়ে গেলো।

এমন সময় হঠাৎ সরকার পক্ষ থেকে এসে হাজির হল বিরাট অঙ্কের টাকা, পুরস্কার স্বরূপ। পুরস্কার পেয়েছে পল্লব। হতবাক সুভদ্রা।

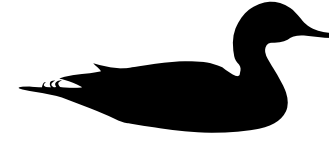
আসলে আজ পল্লব বিখ্যাত ব্যক্তি। কারণ উগ্রপন্থীকে ছেড়ে দেবার আগে তাকে এমন একটি ইঞ্জেকশান পল্লব দিয়েছিলো ডাক্তারকে কাজে লাগিয়ে যা শরীরে কাজ করে ৭২ ঘন্টা পরে। অর্থাৎ ৭২ ঘন্টা পরে উগ্রপন্থী ঐ ওষুধের কারণে মারা গেলো। মন্ত্রী মহাশয় তো মেয়ে ফেরৎ পেয়েই গেছেন --- অতএব বিখ্যাত হল পল্লব। পুরস্কার বাঁচিয়ে দিলো তার পরিবারকে যদিও আজ সে হারিয়ে গেছে জীবন খাতার পাতা থেকে।

## ভাবনা

চিরশ্রী ও মধুশ্রী দুই বোন । চিরশ্রী কনসার্টেশানের কাজ করে । মধুশ্রীকে নিজের অফিসে নিতে চেয়েছিলো তবে সে রাজি হয়নি । কারণ সে কনসার্টেশানকে সাপোর্ট করেনা । তার মতে : মাদার নেচার নিজের রাস্তা নিজেই বেছে নেবেন । আর একঘেয়ে ময়ূর ফয়ূর দেখে দেখে আমরা বিরক্ত । আসুক না আরো সুন্দর পাখী । প্রাণী । ভাগ্যিস ডাইনো চলে গেছে ! কোটি কোটি বছর ধরে, মহাবিশ্ব তো ইভলভ করছে।

একদিন দুই বোন মিলে ড্রাইভ করে যাচ্ছিলো হঠাৎ একটি বাচ্চাকে চাপা দিয়ে দিলো ওদের গাড়ি । চিরশ্রী না দেখলেও পাশে বসা মধুশ্রী দেখলো যে বাচ্চাটির মা যেন তাকে ছুঁড়ে গাড়ির সামনে ফেলে দিলো । যথারীতি বেশ কিছু অর্থ খসলো ওদের । খুব বেশি লাগেনি বাচ্চাটির । তবুও ।

এই ঘটনার পরে মধুশ্রী বলে উঠলো : চিরু এখনো কি তুই মনে করিস কনসার্টেশান প্রয়োজন ? এরকম মানুষের প্রজাতিকে বাঁচাতে আমরা প্রিসার্ড করবো যারা ইচ্ছে করে নিজের জাতির ক্ষতি করে ? **চিরশ্রী নির্বাক ।**



## ইনফর্মার

ছেলেটিকে যখন প্রথম দেখি জানতাম না যে সে এত শিক্ষিত । পেশায় প্রযুক্তিবিদ ।

ভারত থেকে একটি এম-টেক ডিগ্রী নিয়ে এসেছিলো পরবাসে । দেখতে শুনতেও ভালো । কাজ করতো ইনফর্মার হিসেবে ।

যেকোনো জায়গায় গিয়ে খুব সহজেই মিশে যেতে পারতো লোকের সঙ্গে । তারপরে তাদের হাঁড়ির খবর সংগ্রহ করতো

নিপুন ভাবে । সেই খবর নিয়ে এদিক থেকে ওদিক করেই দিব্যি কেটে যাচ্ছিলো । সেই জীবনধারায় কিছুটা রদবদল হল পুলিশ শৃঙ্গুর পাওয়ায় । ফা অর্থাৎ ফাদার ইন ল ছেলোটিকে ইনফর্মার হিসেবে নিযুক্ত করলো । খবর পাচার করা ও তথ্য সংগ্রহ করে করে মানুষের অভিষাপ কুড়ানো এই মেধাবী ছেলোটি আজ পড়ে আছে মর্গে । ব্রিসবেনের এক মর্গে । প্রচন্ড বন্যায় নুয়ে পড়া শহরে আজও আমাকে সাঁতরে মর্গে আসতে হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য । আমি ব্রিসবেনের বাঙালি ডাক্তার পার্থ দত্ত ।

ছেলোটি নিহত হয়েছে ছোবরার আঘাতে । গুপ্তঘাতকের কাজ ।

মারা যাবার পরে লাশ পড়ে ছিলো । বাড়ির লোকেরা কেউ আসেনি ।

বাড়ির লোক বলতে স্ত্রী ও কন্যা । শৃঙ্গুরের সঙ্গে শাশুড়ির বিয়ে হয়নি কোনদিনই । একসঙ্গে ছিলেন অনেক বছর । এখন আলাদা হয়ে গেছেন তাই শৃঙ্গুর আসেননি । আসেনি কোনো পুলিশের লোক কারণ ও রেজিস্টার্ড ইনফর্মার নয় । ওকে কেবল ব্যবহার করতেন ওর শৃঙ্গুর !

আর স্ত্রী ?

তাঁর বক্তব্য : এরকম কথা পাচার করা বিস্টের মৃত্যুই আমাদের কাম্য ।

নাহ্ কোনো সহানুভূতি নেই আমাদের এরজন্যে । পুরুষমানুষ এরকমই ।

আমার বাবাও তো মা-কে ফেলে পালিয়ে গেলেন এতদিন পরে ।

বাবার প্যারালাল জীবনের কথা মা-কে তো একবার সে জানাতে পারতো !

সে জানতো না কিছুই এ তো বিশ্বাস করা যায়না ।

## মেক আপ

অভিনেত্রী শীতলের বহুদিনের শখ প্রখ্যাত অভিনেতা বাজকুমারের সঙ্গে অভিনয় করে। সুযোগ এসেও গেলো। আর্মি অফিসারের মেয়ে শীতল পার্টি, ড্যান্স, ওয়াইনে অভ্যস্ত ছিল একটি মডেলিং এর কাজ পেয়ে সোজা মুম্বাই উড়ে গেলো। সফল মডেল হয়ে ঢুকে পড়লো সিনেমায়। তারপরে অভিনয় ও রূপের কল্যাণে সে প্রথম সারির অভিনেত্রী হয়ে উঠলো।

একদিন এসে গেলো বাজকুমারের সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ। ছবির নাম : পর্দার অন্তরালে। শুটিং বেশিরভাগ টাই জাহাজে। রহস্যময়, গ্ল্যামারাস, চিরতরুণ, ডাইনামিক বাজকুমার। যাঁর টানটান মেদহীন দেহ যেকোনো তরুণীর স্বপ্ন। হ্যাঁ এই সিন্ধু প্যাকের যুগেও। মুখে যৌবনের চপলতা।

শুটিং এর পরে বাজের সঙ্গে গল্প করেই সময় কাটিতো। এই পর্দার বাজ কুমার ?

এত্তো ভালোমানুষ উনি ? মনে মনে তারিফ না করে পারেনা শীতল।

একদিন রাতের বেলায় খুব ঝড় উঠেছে। সামুদ্রিক ঝড়। হাওয়ার তোড়ে উড়ে যাচ্ছে পর্দাগুলো। এমন সময় বাজ এসে প্রবেশ করলেন শীতলের ঘরে।

জানালা দরজা সব বন্ধ করে দাও। প্রচন্ড ঝড় উঠেছে। বলেই ঝড়ের মতন ঘরে থেকে বেরোতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন।

শীতল ছুটে এলো তাঁকে তুলতে। হাতে খুলে এলো পরচুলো, দু একটি দাঁত বুঝি পড়ে আছে মেঝেতে। কোনক্রমে উঠে ফোকলা দাঁতে হেসে উঠলেন বাজকুমার, বয়স যাঁর ৭০, পাক্কা ৭০।

নিজের মনেই বলে উঠলেন : এই ফিল্ডটাই এরকম। ৭০ এও হতে হবে ষোড়শী, তোমাকে ! সবই মেক আপের কল্যাণে।

বাজকুমারের নতুন রূপ দেখে ঈষৎ অস্বস্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নিলো তরুণী নায়িকা শীতল। দেহে ছড়িয়ে পড়লো এক অদ্ভুত শীতলতা। এক অজানা ভয়ে।

## অসুখ

ডা: মাথুরের বাড়ি রয়েছে এক ক্যানসার রুগী। তার কন্যা। কিন্তু ডা: একটুও বিচলিত নন। মেয়ে ছিল বেজায় মোটা। সবাই ফ্ল্যাপাতো মুটকি বলে। বিয়ে হবার কোনই সম্ভাবনা ছিলনা। কারণ চিরকাল ছেলেরা সুন্দরী মেয়ে খোঁজে। চিন্তিত ছিলেন ডাক্তার। ব্যায়াম, ডায়েটিং কিছুতেই কিছু হবার নয় এমন সময় বেজিন রিং আবিষ্কারের মতন ডাক্তার স্বপ্নে পেলেন এক ওষুধ। যা ক্যানসার সারায়। একটি মহৌষধ।

তৈরি হল এক ধরণের ছত্রাক থেকে। সেই ছত্রাক পাওয়া যায় কেবালার সুপ্রাচীন এক পাহাড়ের এক নিরালা গুহায়। প্রসেস করতে কিছুদিন সময় নিলো। কৰ্কট রোগ নিরাময় হয় এতে। যেই কারণে রোগ শুরু হয় সেই জিনের বৈকল্য সারিয়ে দেয় এই ছত্রাক। একে ভক্ষণ করে তবে সেবন করতে হবে, ন্যানো টেকনোলজি। ডাক্তার নাম দিলেন কৰ্কটবধ ভক্ষণ-ওষুধ প্রয়োগের কিছুদিন পরেই সেরে গেলো মেয়ে। আজ আর তার দেহে কোনো অ্যাবনর্মাল সেল নেই। নেই বিন্ডুমাত্র ম্যালিগনেসিস। পূর্ণ সুস্থ সে। লাভ বটে হয়েছে আরেকটা। ক্যানসার হওয়াতে তার শরীর সম্পূর্ণ মেদহীন হয়ে গেছে। কোনো ডায়েটিং ও ব্যায়াম

ছাড়াই। কে বলে অসুখ মানেই তা হানিকর? এ যে এক টিলে দুই পাখি।

পূর্ণ চন্দ্রের শেষ মধুরিমা টুকু শুষ্ক নিতে নিতে হেসে ওঠেন ডাক্তার। নীরবে ধন্যবাদ জানান অদেখা ঈশ্বরকে। ধন্যবাদ জানান মেদ বর্জনের অভিনব এই প্রক্রিয়ার জন্য।

## Reference

Ayurvedic bhasma-- oldest form of nanotechnology: BARC prof

The bhasmas' used in Ayurveda for treatment of various diseases for the past several centuries is the oldest form of nanotechnology, said head of solid state chemistry section at Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Mumbai, Prof AK Tyagi. Tyagi was in the city to take part in a one-day seminar on 'Nanotechnology and its application' at department of chemistry in Veer Narmad South Gujarat University (VNSGU). "We are preparing to use it again for various purposes," Tyagi said. The seminar was organized with funds given to the department of chemistry by University Grants Commission (UGC) under special



assistance programme. The department is also awarded five research scholarships.

Apart from Tyagi, Dr PA Hassan, Dr V Sudarshan and Dr Dimple Dutta, all from BARC, participated in the seminar and delivered lectures.

## লাল বুট জুতো

লাল বুট জোড়া নিশাকরের ভারি প্রিয়। শিবেনের রুমমেট গোয়েন্দা নিশাকর ওর কেস সলভের গল্প বলতো। কোনো ঘন জঙ্গলে এক বুড়ো, লোক নেমতল্ল করে নিয়ে যেতো ও অত্যাধিক ঘুমের ওষুধ দিয়ে হত্যা করে কাছেই এক খোলা ময়দানে চিল শকুনের ডেরায় ফেলে দিয়ে আসতো। নিহত ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যেতো না। সাইকো বুড়ো ধরা পড়েছে। সে মানুষকে নৃশংস ভাবে মেরেই আনন্দ পায়।। সাক্ষ্য পাটিতে নিশাকরের বস মিস্টার আইভর স্মাইলিকে এই কথা জিজ্ঞেস করে শিবেন। উনি হতবাক : নাহ্ এরকম কোনো কেসের কথা তো শোনেননি উনি।

পরেরদিন সকালে ড্যান্ডেনং রেঞ্জের কাছে গাড়ি খারাপ হয়ে যায় শিবেনের। নেমে ঝর্ণায় জল আনতে গেলে দেখতে পায় একটি লাল বুট জুতো। সায়েলেন্ট ভ্যালির দিক থেকে

একটি গা হিম করা আওয়াজ ভেসে আসে ! যেন শকুনের দল চিবিয়ে থাকছে কোনো মৃতের শরীর !

## মুখোশ

মেলবোর্নে চাকরি করে সুভদ্র। নতুন এসেছে এইদেশে। কাজ করে ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে। থাকে প্রহরণ নামক এক সাবার্বে। অফিস ফেরৎ ট্রামে করে অনেকটা পথ আসে এমন একদিনে দেখা পেলো লিসার। বুড়ি। ট্রামযাত্রী। অসুস্থ। আগ বাড়িয়ে পরোপকার করা সুভদ্র ওকে বাড়ি পৌছে দিতেই দরজা থেকে ও হাত চেপে ধরে। খুলে ফেলে মুখোশ। ঠিক এক বৃদ্ধার মতন দেখতে সেই মাঙ্ক ! করুণ স্বরে বলে : অনেকদিন ধরেই আমার বয়স্কেণ্ড নেই। লোকে হাসে আমাকে নিয়ে। তাই তোমাকে ছলনা করে ধরে এনেছি। আমাকে ফেলে যেওনা প্লিজ ! আমি অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে। বাবা সাহেব মা লেবানিজ !

সুভদ্রও অনেকদিন ধরেই ভিসাটা এক্সটেন্ড করার কথা ভাবছিলো। সাম্প্রতিক নিয়মের কড়াকড়িতে যা হচ্ছিলো না। এরকম এক জলজ্যান্ত পাত্রী পেতে সে ও খুশি ! অ্যাটলিস্ট এবার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি তো পেয়ে যাবে ! মুখোশের

আড়ালে লুকিয়ে যুবতী রূপসী লিসা যা আদতে ওর রোড টু ভিসা ।

## পুজো

কর্ণাটকের এক শহরতলি । পাল পাল উত্তর পূর্ব ভারতীয় মানুষ এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছেন মুসলিমদের দাঙ্গার ভয়ে যদিও ওদের সজাগ চোখ চারপাশে । দশেরা আগত । হিন্দু পুরোহিতেরা পুজো, রাবণ নিধন নিয়ে ব্যস্ত । বেগম পরভিন ধর্মস্থানে প্রবেশাধিকার পাননা নারী বলে । নিজগৃহের পেছনে একটি ক্ষুদ্র দরজা । সেখান দিয়ে রাতের আঁধারে পাহাড়ি হায়েনাদের তোয়াক্কা না করে পালিয়ে যাচ্ছেন অনেক মানুষ । বেগম সাহেবার কল্যাণে । ফেলে যাওয়া পথের পাশেই ক্রমাগত বাজছে কাসর ঘণ্টা । মানস মন্দিরে ।

## বোরখা

মধ্যভারতের ছোট শহর আলোয়ার । হিন্দু মুসলিমের লড়াইয়ের চেয়েও বেশি জাতপাতের লড়াই হিন্দুদের মধ্যে । গানরসিকা ব্রাহ্মণকন্যা মৃণালিনী প্রেমে পড়লো দলিত পুত্র মকরন্দের । বাড়িতে কড়া শাসন , জোড়া জোড়া চোখ সদাজগ্রত । পাহারা দিয়ে চলে । সঙ্গীত বিশারদ বোরখা আবৃত্তি তসলিমা বেগম আসেন নিয়মিত গান শেখাতে । আগে সপ্তাহে একদিন আসতেন এখন রোজ ।

চাঁদনি রাতে মূল ফটকের উপরে দিকে বোরখা খুলে হাসে মকরন্দ । আজ কোমল রে বাজাতে গিয়ে নি বাজিয়ে ফেলেছিলো -- ।





## দার্জিলিং ট্রাভেল্‌স্‌

দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলাম বুড়ো বয়সে । হেমন্তের রেশ বাতাসে । বাইরে ঘন কুয়াশা । ফেব্রার সময় একটি ক্যাব বুক করে এলাম । এক হাত দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না । গাড়ি চালাতে খুবই অসুবিধে হচ্ছে ।

চালককে জিজ্ঞেস করলাম : ফগ লাইট নেই কেন ?

অনেক রূপিয়া লাগে মেমসাহেব ।

রূপিয়া দিয়েই করবে । আমরা তো ভালো পয়সা দিচ্ছি তোমাদের । যদি দুর্ঘটনা ঘটে ?

মালিক তো সেটাই চান মেমসাহেব ।

মানে ?

ও আমাদের সঙ্গে লাভা , লোলেগাঁও, মিরিক ঘুরে ঘুরে বেশ দোস্ত হয়ে গেছে । মনের কথা খুলে বলছে । কমবয়সী মা মরা ছেলে । গোখাঁ । বলছে : মালিক এমনই আছেন । টুটা ফুটা গাড়ি বার করেন । অ্যাকসিডেন্ট হলে ইন্সুরেন্স

কোম্পানি পাইসা দেয় । আর অ্যাক্সিডেন্ট প্রায়ই হয় । অনেক লোক ও ড্রাইভারের ইন্তেকাল হয়ে গেছে । মালিকের উমর জাদা নেহি লেকিন প্রিফ পাইসা চেনেন ।

আমি আঁতকে উঠি -তাহলে তুমি এখানে কাজ করছে কেন ?

খুব করুণ হেসে ও বলে ওঠে : উপায় নেই মেমসাহেব । কাজ করতে গিয়েছিলাম জুট মিলে । সে বন্ধ হয়ে গেলো । কোনো টাকা পেলাম না । এখানে এসে ড্রাইভারি শিখে কাজ নিলাম । মালিক ছাড়তে চান না সহজে । কাজ দেবার সময় বন্ড সই করিয়ে নিয়েছেন ৫ বছরের , সবে তো ২ বছর হল-- ঠাঁর পুলিশে বহুৎ চেনাশোনা । বাবা এনকাউন্টার স্পেশালিষ্ট । অনেক ক্রিমিন্যালকে মেরেছেন নিন্দুকে বলে ভালো আদমিকেও । কেউ ইসকে খিলাফ কাম করলে , বাত বললে এনকাউন্টার করিয়ে দিতেন । সবাই ভয় পায় ইন্সপেকটর খিলজিকে । আলাউদ্দিন খিলজি ।

মনে মনে ভাবি: খিলজিই বটে । কথায় বলে হিন্দি রিপটিস্ ইটসেল্ফ ।

পথের ধারে দার্জিলিং এর বিখ্যাত টয়ট্রেন কেমন একটা বিকৃত শব্দ করে চলতে লাগলো হঠাৎ । কুয়াশায় গন্তব্যও জানা শুধু কবে পৌঁছাবে তা জানা নেই ।

## রুদ্রাক্ষ

কেতু চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ পুলিশের হেফাজতে । সকাল সকাল এসে ওরা নিয়ে গেলো কেতু কে । সে সারারাত ধরে সার্ফিং করে । আমেরিকার শহর উডগ্রাসে ,বাড়ির দোতলায় বসেও কেতু অপরাধী । একটি পিপড়েও মারেনি যে কোনোদিন ! অপরাধ ? রুদ্রাক্ষ শব্দটা বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে খুঁজে বার করে ওয়েবপেজ খুলে দেখছিলো । তাতেই বিপত্তি । কারণ ঐ শব্দটা ভারতের উগ্রপন্থীরা আন্তর্জালে কোড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ব্যবহার করে । পুলিশ যখন জানতে চায় : এরকম সেন্সিটিভ ওয়ার্ড সে সার্চ করছিলো কেন ? বলে : স্পিরিচুয়াল শব্দ যে ভয়ানক বিপদ ডেকে আনবে কোনদিন ভাবেনি।

নিছক রুদ্রাক্ষের বিপরীত ফল ?

## ময়না তদন্ত

পত্রলেখার স্বামী একজন ডাক্তার। সমুদ্র নগরী কনকপুরের বাসিন্দা। লোকাল হাসপাতালে কর্মরত। হাসপাতালের মর্গে বহু শব ব্যবচ্ছেদ করে থাকেন। এক বর্ষণ মুখর রাতে উনি বাড়ি ফিরলেন কাকভেজা হয়ে। বিষন্ন। বহুদিনের এক সখার, দুর্ঘটনায় ছিন্নভিন্ন দেহাংশ জুড়তে গিয়ে নিজে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছেন - ভেবেছিলো পত্রলেখা ওরফে লেখা। কিন্তু পর্দার অন্তরালে ভিন্ন বিষাদ। শোনা যাক ডাক্তারের মুখ থেকেই :

কলেজে পড়তে বিষণ ( মৃত ব্যক্তি ) আমার বোন সুশীর প্রেমে পড়লো।

সুশী ওরফে সুশীতা- বিষণ অন্ত প্রাণ কিন্তু বিষণ যেন বিষণ বিন্দু।

ওপরে ওপরে ভাব থাকলেও দূরত্ব বজায় ছিলো সুশীর সঙ্গে। আমরা অবাক হয়ে যেতাম দেখে যে ছেলেটি সুশীর সঙ্গে এত মেশে কিন্তু বিয়ের কথা হলেই নিশ্চুপ। আমরা ভাবতে আরম্ভ করলাম যে ছেলেটি ফ্লার্ট। একসময়ে জীবনের নিয়মে সে হারিয়ে গেলো সুশীর ভুবন থেকে। আজ এত বছর পরে নিয়তির আদৃত পরিহাসে তাকে দেখলাম মর্গে। দুর্ঘটনায় নিহত।

বয়স বাড়লেও চেহারায়ে রয়েছে যৌবনের ছাপ। কে বলবে ৪৫ পেরিয়েছে! নিখুঁত দেহ, টানটান চামড়া। শুধু নেই একটি টেস্টিস। অন্যটিও অপরিণত। স্বাভাবিক ঋতুর খেলায় সে মেতে উঠেছিলো প্রেমে, মনে মনে। দেহ সাহা দেয়নি। থেকেছে চুপ করে, ভুল বুঝেছি আমরা। পারতো না কি সে আমার বোনকে না জানিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলতে! কিন্তু সুশীর জীবন নষ্ট হতে দেয়নি বিষণ। সরে গিয়েছিলো চিরতরে নিজের অক্ষমতার কথা না জানিয়েই। কথায় বলে সত্য গোপন থাকেনা। হয়ত তাই আজ এতবছর পরে সত্যের উদ্ঘাটন হল -- ময়না তদন্তকালে।

## ভাগ্য চক্র

কম্পিউটার বিজ্ঞানী , ড: কিন্নর রায় । বেল ল্যাবের সিনিয়র বিজ্ঞানী । একরোখা , কঠোর , ক্ষমাহীন । সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে বহু ক্ষেত্রেই এই কারণে । নিজের একমাত্র দিদির সঙ্গেও সম্পর্ক ছেদ করেছে দিদি এক অযোগ্য লোককে বিবাহ করায় । জামাইবাবু পরাগ ভূষণ পাকড়াশী , কিন্নরের দিদি কিস্কিনীর তুলনায় কিছুই না । নেহাৎই সাধারণ এক- বি এ পাশ মানুষ যাঁর কাজ কলেজে কেরানিগিরি করা । বলার মত কিছুই নেই তাঁর । ছাপোষা মানুষ । কিস্কিনী আই আই টির ফার্স্ট গার্ল । গানে, আঁকাই , নৃত্যে পটিয়সী । এই সর্বগুণ সম্পন্ন দিদি এখন তাঁর জামাই বাবুর মতন এক ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের বাছ বন্ধনে ----- বিয়ের আগে প্রচণ্ড আপত্তি ছিলো কিন্নরের - --আই কান্ট ইম্যাজিন আ ব্লাডি ক্লার্ক ম্যারিং ইউ । ওর কী এডুকেশন কীই বা এক্সপোজার ? হাউ উইল ইউ স্পেন্ড দা লাইফ টু গেনার ? কিন্নরের চোখে বিস্ময় যেন আজব এক জন্তু তার দিদির বিয়ে করতে চলেছে । দিদি কোনো বাদানুবাদে যায়নি । একসময় বাবা -মাকেও কিন্নর বাধ্য করেছিলো কন্যার সাহচর্য থেকে বেরিয়ে আসতে । দিদির মুখদর্শনও যেন অশুভ ।

গর্ব , গর্বে বুক ফুলে ওঠে বাবা মায়ের সন্তানের জন্য । সেই সন্তান ভুল পদক্ষেপ নিলে তাকে কি ছেঁটে ফেলা যায় ? ফলত দুরত্ব বাড়ে পুত্রের সঙ্গে । আন্তর্জালে পাত্রী খুঁজে পুত্র বিয়ের চেষ্টা করে কিন্তু বাড়ির লোককে সামনে না আনায় বহু ক্ষেত্রেই বিয়ে ভেঙে যায় । অবশেষে এক জায়গায় সম্বন্ধ স্থির হয় । মেয়েটি খুবই মেধাবী - ঈশ্বর পৃথুলা । সহজে পাত্র জুটছিলো না । ক্লিভেজ উন্মোচন করেও বিশেষ সুবিধে হয়নি । সাহসী সাজ যেন অরণ্যে রোদন । কিন্নর আবার ইন্তুলেকচুয়াল । নারীর সৌন্দর্য তাঁর কাছে গুরুত্বহীন । তার মতে চেহারা ফেহারা নিয়ে চট্টল লোকেরা মাথা ঘামায় - সে সেরিব্রাল মানুষ পছন্দ করে । অতএব বিয়ে হয়ে গেলো । কিন্তু সেরিব্রাল বললেই কি সারাজীবন তার সংস্পর্শে থাকা যায় ? যায় না । ভাগ্যচক্র এমনই এক বস্তু । তারই চক্রে পিষ্ট হয়ে ড: কিন্নর রায় আজ এক ব্যাক্সের কাউন্টার কর্মী । ক্লায়েন্ট ছুঁড়ে মারে চেক ও টাকার বাড়িল তারই দিকে , অবহেলায় । থাইরয়েডের ক্যানসারে আক্রান্ত কিন্নর বেশি পরিশ্রম করতে পারেনা । জীবন চালিয়ে যাবার জন্য অর্থের প্রয়োজন কাজেই কিছু না কিছু করতেই হয় ।

*দিদি জামাইবাবুর মফঃস্বলের মধ্যবিত্ত , শ্যাওলা ধরা কোয়ার্টারের কোণায় গভীর রাতে মায়াবী হাসি হেসে ওঠে বাঁকা চাঁদ ।*

## কোকেন

ভারতের মতন দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে যেখানে নেতা, নেত্রী ও মন্ত্রী মশাই সবাই ষড়যন্ত্রী মশাই সেখানে আজকাল যদি হঠাৎ সৎ নেতার আবির্ভাব হয় লোকে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে ওঠে। হল কি! বটে! এরকমও হয় নাকি? ---

নেতা কৃপাল সিং। তার পার্টির নাম গডস জাস্টিস। কারণ ঔনার মতে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান ও তাঁর বিচারে অন্যায়ে স্থান নেই। কৃপাল সিং খুব সৎ ও ক্লিন নেতা। এবং সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। সুষ্ঠুভাবে চলেছে রাজ্য। ক্রাইম দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ডন্ড হাতে নিচ্ছেন। এহেন নেতার একমাত্র পুত্র দলবীর সিং ধরা পড়লো ড্রাগসের কারবারী রূপে। কোকেন সেবন ও পরিবেশন এবং একই সঙ্গে অন্যান্য হার্ড ড্রাগস্ যুব সমাজে ছড়িয়ে দেবার অপরাধে তার কঠিন সাজা হল। মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র বলে রেহাই পাবেন, অনেকেই ভেবেছিলেন কিন্তু মন্ত্রী মশাই বড়ই সৎ। নিজ পুত্রকে বাঁচাবার জন্যে তাঁর সমস্ত তাকৎ অর্থাৎ পাওয়ারের প্রয়োগ করেন নি। জেলে ভরেছেন, সুষ্ঠুভাবে বিচার হয়েছে ও এখন সে কয়েদখানায় দিন কাটাচ্ছে। পলিটিক্যাল মাইলেজ খুবই ভালো পেয়েছেন মন্ত্রী মশাই। পার্টির কমীরা বারণ করেছিলেন কিন্তু উনি

শোনে নি। তাই তো আজ তার মুখ আরো উজ্জ্বল হয়েছে। সবাই ধন্য ধন্য করছে -- এরকম সৎ ও নিষ্ঠাবান। কর্তব্য পরায়ণ ----

দলবীর সিং একই সঙ্গে ভারতের জেলে ও সুইজারল্যান্ডের এক হোটেলে। দেখেছেন এক রিপোর্টার। মন্তি করছিলেন দলবীর, নারী ও কোকেন সমেত।

---কোমড়ে দুলিয়ে ---দম মারো দম ---

ভারতের জেলেও আরেক দলবীর, সেও ফুটি করছে তার মতন করে কারণ আগামী বেশ কিছু বছর ধরে তার রোটি কাপড়া আর মাকানের চিন্তা নেই। ফুটপাথের বাসিন্দা দলবীর সিং এর ডামি বলজিং সিং ও গান গাইছে, নিচু স্বরে ---

জো জিতা ওহি সিকন্দর, নসীব আপনা আপনা -----  
-----



## আস্তিক

বনের ধারে সুন্দর এক মহল অর্থাৎ বাড়ি। জনরব : বাড়িতে ভুত আছে। নানান ধরণের স্পুকি অভিজ্ঞতা হয় মানুষের। লোকে ছেড়ে চলে যায়। আজকাল তো কেউ ভুতে বিশ্বাস করেন না তাই বহুবার হাতবদল হয়েছে। বাড়িটির মালিক এক প্রফেসর যাঁর বাজারে সাধুবাবা বলে নাম আছে। ঈশ্বরই সব, তিনিই সব চালান, বাস্তব জগৎ মায়া এইসব তত্ত্ব প্রচার করেন। কলেজে পড়ান। দর্শনের অধ্যাপক।

একদিন এক ছাত্র এসে প্রশ্ন করলো : স্যার আপনি বারবার বাড়ি বিক্রি করেন কেন? বরং ওটাকে কোনো আশ্রমে দান করে দিতে পারেন। আপনি এত বড় আস্তিক, এই বাড়ি পেলে অনেক আশ্রমের হর্তা কর্তাই উপকৃত হবেন। আর সব কিছুই তো মায়া, কাজেই মূল্যহীন।

প্রফেসর এক চোটি হাসলেন। হেসে বললেন : আরে দূর কে বললো আমি আস্তিক? আমি নাস্তিক, কঠোর ভাবে ভগবান বিরোধি। ঈশ্বর বলে আবার কিছু আছে নাকি? ওসব বোকা লোকেদের বুদ্ধি বানাবার প্রয়াস। আর বাড়ি আমি দান করবো কেন? বার বার বিক্রি করবো, ভুতের ভয় দেখিয়ে লোক ভাগিয়ে নতুন ক্রেতা যোগাড় করে আরো

লাভবান হব। সিম্পল থিওরি। নেই ম্যাক্সওয়েল কন্সট্যান্ট, নেই কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ডের অনু পরমানুর খেলা, নেই ট্যাকিওনের কথা, নেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অন্য প্যারালাল ইউনিভার্স থেকে চুইয়ে পড়ার থিওরি---প্রকৃত প্রদত্ত বুদ্ধি খাটাও আর মালদার হও। দর্শনের মূল মন্ত্রই আনন্দে থাকা। আর জগৎ তো রিলেটিভ কি বলো? ক্লাসে পড়াই নি --- ----!!



## পুরুষ

ইঞ্জিনিয়ার পরিতোষ ঘোষ বহুদিন যাবৎ অবিবাহিত ছিলেন । এখনও আছেন তবে নারী সঙ্গ করেন । উচ্চ বর্ণের হিন্দু ও মহাপুরুষদের গালাগালি দিতে ছাড়েন না । ছোটবেলায় ক্লাসে কেউ জিজ্ঞেস করেছিলো : এই , তুই কোন ঘোষ ? যে পোষে মোষ ??এখন ওগুলো মনে পড়লে গা জ্বলে যায় পরিতোষের । বড় বড় যোগী পুরুষ ও সাধক সবাই তার মতে ভুত ও নিকৃষ্ট শ্রেনীর । বিজ্ঞান নাকি একদিন সব বার করবে । সব বলতে কি তার সঠিক উত্তর ঘোষ বাবুর কাছে নেই । তবুও উনি আশাবাদী । আজকাল চ্যাট হয়েছে । এসেছে বাজারে ওয়েবক্যাম । ঘোষ বাবুর কাছে তরুণীদের মেসেজ আসে । আস্তে আস্তে মেসেজ রূপান্তরিত হয় মাসাজে , যৌন মাসাজ ।

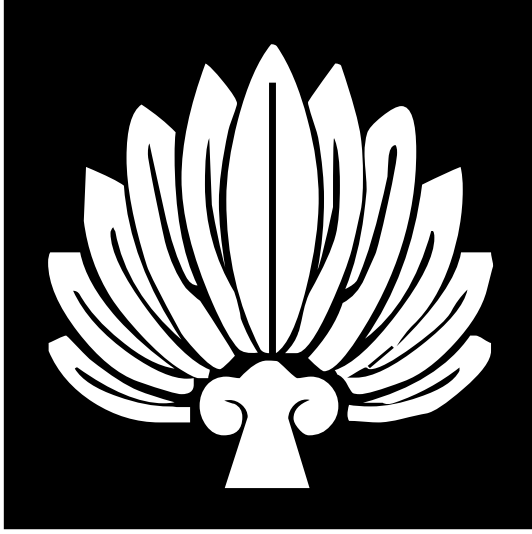
মাঝরাত অবধি জেগে বাড়ির লোক শুয়ে পড়লে ঘোষ বাবু ওয়েবক্যামে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেখান , অন্যদিকে এক তরুণী । পকব্ বিদ্রোহী , নীলনয়না ( কন্ট্রাস্ট লেন্সের সৌজন্যে ) । হোটলে গিয়ে সেক্স করেন । লোকে বলে মিড লাইফ ক্রাইসিস । আগে বিয়ে করার কথায় না না করেছেন এখন যৌন বৃশ্চিকের কামড় এড়াতে পারছেন না । পরিতোষ এখন মহাপুরুষদের কিছুটা সম্মান দেন । কারণ

তাঁরা বৃশ্চিককে দমন করতে পেরেছেন । তাই হয়ত তাঁরা মহাপুরুষ , পুরুষ কিংবা কাপুরুষ নন ।

ঘোষ বাবুর দাদা মনতোষ বিয়েটা করেছেন সময়মতই , তবুও---

উনি ডাক্তার । নারীর নাড়ি টিপতে টিপতে ডুবে গিয়েছেন নানীমূলে । সংসার ধর্ম পালন করেছেন নিষ্ঠাভরে । এখন অবসর প্রাপ্ত । ভাগনে ভোঙ্কলের আছে ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়ায় লোক চালানোর ব্যবসা । অস্ট্রেলিয়ায় জন সংখ্যা অত্যন্ত কম । ভারত থেকে মানুষ ফেরি করা তার কাজ । বছরে কয়েক মাস সে মামাকে সঙ্গে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যায় । মামী জানেন বেড়াতে যাচ্ছেন । বেড়াতেই যান তবে সমুদ্র কিংবা পাহাড়ে নয় , ওদেশের বেশ্যালয়ে । যোগাযোগ হয় আন্তর্জালে বেশি । সাদা মেয়ে , কালো মেয়ে , বাদামী মেয়ে , হলুদ মেয়ে সমস্ত চেখে দেখা হয়ে গেছে ।

অলস দুপুরে , সুরা পাত্রে চুমুক দিতে দিতে ভাগনে কে বলে ওঠেন অবসর প্রাপ্ত , আলোক প্রাপ্ত ডাক্তার : যিনি অনেক কালচারাল ক্লাবের প্রেসিডেন্ট -বুঝলি ভোমলা , বৌয়ের সঙ্গে শুয়ে শুয়ে শালা ক্লান্ত , শেষ বয়সে একটু রাঙি না চুদলে ভালোলাগে ?



## সম্পাদক

হিন্দোল গুপ্ত হোয়েফনারের জন্ম জার্মানিতে । বাবা জার্মানির ইঞ্জিনিয়ার । বাঙালী । মা জার্মান । হিন্দোল দুটি পদবীই ব্যবহার করে একসঙ্গে । পিতা তাকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত , রবীন্দ্রনাথ , বিবেকানন্দ সম্পর্কে অবহিত করেছেন । যত্ন করে বাঙালী রান্না শিখিয়েছেন । এমন কি বাংলা পড়তে ও লিখতেও শিখিয়েছেন । ছোটবেলা থেকে সে অনর্গল বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে যেতে পারতো । এখন হিন্দোল বাংলায় লেখে । কারণ বাংলা তার মাতৃভাষা । জার্মান কিংবা ইংরেজিতে লেখেনা । বেশ ভালই লেখে । প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সুন্দর এক মেল বন্ধন তার প্রতিটি সৃষ্টি । একটি বাংলা ওয়েবজিনে তাকে লেখা পাঠাতে অনুরোধ করে তার এক বন্ধু । হিন্দোল নারাজ । বারং বার অনুরোধ করেও লাভ হয়না ---আরে এত ঝুল লেখা বেরোয় ওগুলোতে । তুই তোর লেখাগুলো পাঠা । নাম করতে পারবি । লোকেও পড়ে খুশি হবে ।

হিন্দোল অনড় , হিন্দোলের কিছু যায় আসেনা তাতে । সে নাম করার জন্য লেখে না । আনন্দে লেখে । তার মতে বাজার চলতি লেখকদের থেকেও প্রতিভাবান লেখকেরা আড়ালে রয়ে যান । সম্প্রতি একজন মিডিওকার

লেখিকাকে একটি ওয়েবজিন অসামান্য প্রতিভাময়ী বলে  
হাই লাইট আরম্ভ করেছিলো।

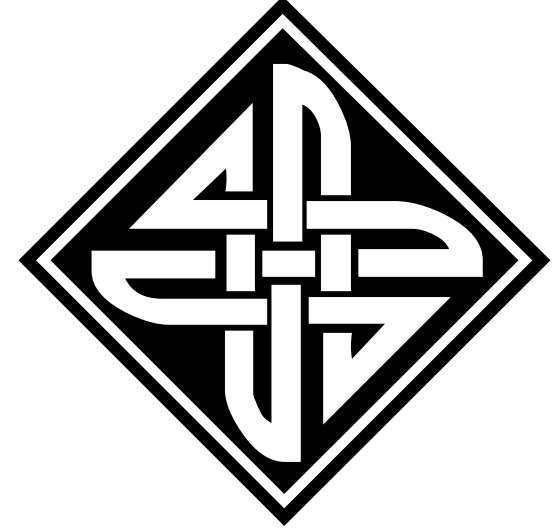
তাতে কারো কিছু যায় আসেনি। কারণ পাঠক অত বোকা  
নয়। তারা সবই বোঝে।

বহুবার পীড়াপিড়ি করা ও বন্ধুত্বের দোহাই দেবার পর  
হিন্দোল বলে ওঠে --

আরে কোথায় লেখা দেবো বল তো? এক বাংলা  
ওয়েবজিনের সম্পাদিকা আভা বোজ এলো। আমার লেখা  
নেবে বলে। আমার এক আত্মীয়ের কাছে শুনে এসেছিলো।  
ভালই ঘনিষ্ঠতা হল। লং উইক এন্ডে আমার স্পোর্টস করে  
করে ঘোরা হল, উই হ্যাড সেক্স, গুড ওয়াইন ----লটস্  
অফ ফান---

তারপরে লেখা ছাপার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেলো।

পরবর্তীকালে আমার এক একটি লেখা তার নামে বেরোতে  
লাগলো। এতদূরে বসে ইমেল ব্যাতিত তাকে ধরার কোনো  
রাস্তা নেই। ওয়েবসাইটের ঠিকানায় চিঠি দিলে ফেরৎ আসে  
। কোথায় অফিস কেউ জানেনা। সাইবার পুলিশও  
এন্টার্টেন করেনা এত হাল্কা কেস। বলে : সারা দুনিয়ায়  
এত বন্ধ ব্লাস্টিং, মার্ডার, রেপ, চাইল্ড সেক্স -----  
আপনার কেসটা লাইনের অনেক পেছনে।



## গোরিলা

ঘন অরণ্যে গোরিলার বাস । তাঁবু পড়েছে একদল শখের আলোকচিত্রীর । তার মধ্যে অগ্রগণ্য নিশা বসু । ফটোগ্রাফির হাত ভালো এছাড়াও সে একটু দামাল মেয়ে । চিরাচরিত ছবির বদলে ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি করতে বেশি ভালোবাসে ।

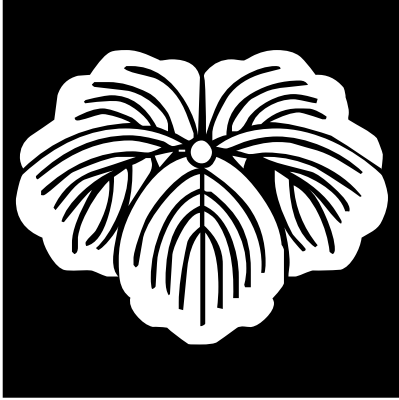
তাই ওরা তাঁবু গেড়েছে এই বনে । কিছুদিন বাদে নিশা ধর্মিতা ।

জানা যায় একটি বন্য গোরিলা তাকে ধর্মণ করেছে , শুধু তাই নয় নিজের পায়ুর মধ্যে নিশার স্তন বৃত্ত প্রবেশ করিয়ে রমণ করায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে বেচারীর নরম নিটোল শরীর । খবর পড়ে গোরিলা বিশারদ ডঃ হেমকান্তি কৈরাল জানান যে ভারতের বনে গোরিলা কি চোরাকারিরা আনলো ? তিনি জীবনে অনেক গোরিলা দেখেছেন কিন্তু জানোয়ার মানুষের মতন পার্ভাট হয়না । তদন্ত বাড়ে এবং ধরা পড়ে এক প্রতিষ্ঠিত বাঙালী লেখক । আমেরিকার বাসিন্দা । আমেরিকায় তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে । নিজের বিধবা মাকে কামরসে টসটস লেখক *anal sex* এবং ওরাল সেক্সে বাধ্য করে , এখন পুলিশের ডয়েপালিয়ে এসেছে ভারতের গভীর বনে । ভায়াগ্রা নিয়ে -গোরিলার পোশাক পরে ; বুক বাজিয়ে আদিবাসী মহিলা ও সন্ত জগতের নিশাদের সে টার্গেট করে সীমাহীন দৈহিক ক্ষুধার

তড়নায় । আরো জানা যায় লোকটি খুব জ্ঞানীশ্রী ও ভালো তবলাবাদক ।

লেখক কল্লোল প্রসাদ মিত্র মুস্তাফিকে মা আদর করে আগে ডাকতেন কল্লু । এখন ডাকেন : উল্লু ।





## বন্ধু

ঋষিকেশ দেবের বিদেশ আসার মাত্র দুই বছর হয়েছে । পড়তে এসেছিলো বাংলার মফঃস্বল থেকে । এখানে এসে রুমমেট হিসেবে পায় এক ভারতীয়কে । ছেলেটি বেজায় ভালো, মেল নার্স হিসেবে কর্মরত । নাম নারায়ণ পাড়িয়া । ঋষির জামাকাপড় ইন্ড্রি থেকে শুরু করে লাঞ্চ বানিয়ে দেওয়া সমস্ত করে দিতো । নারায়ণ ছিলো ফেনোমেনাল কুক । কথা হত ইংলিশে । বিদেশের একাকীত্ব কাটতো গল্প গুজবে আর নেটের চ্যাটে । কত বন্ধু সেখানে । তবে রোজ ঝগড়া হত । উনিশ থেকে বিশ হলেও কোমড় বেঁধে ঝগড়া করতো ওরা । তারপর অন্য সাইটে গিয়ে নোংরা কমেন্ট দিতো , গালাগালি দিতো ।

ঋষির খুব খারাপ লাগতো ! যখন প্রথম চাকরি পেলো , জানিয়েছিলো ফোরামে । ওমা ! ওরা যেন চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে এমন ভাব ! এইসব দেখে দেখে ভেঙে পড়ে খুব । নারায়ণ ইংলিশে বলে : মানুষ এরকমই । তুমি নতুন নামছো বাইরের দুনিয়ায় । পরে দেখবে এরকম মানুষেই দুনিয়া থিক থিক করছে !

বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশানে ওরা যায়না । সেদিন নবমীর দুপুরে গরম গরম থিচুরি ও বাংলাদেশী দোকান থেকে আনা

ইলিশ ভাজা খেতে খেতে ঋষি খুব মনমরা হয়ে ছিলো ।  
নারায়ণ আজব ছেলে । স্নান করে খাবার পরে । স্নান  
করতে করতে হঠাৎ গান গেয়ে উঠলো এবং আশ্চর্য সেই  
গান --রবীন্দ্র সংগীত , ভরা থাক স্মৃতিসুধায় হৃদয়ের  
পাত্রখানি ! লক্ষ দিয়ে ঋষি বাথরুমের দরজার কাছে !

বের হ , বের হ উল্লুক , তুই বাঙালী দুই বছর ধরে বলিস্  
নি ?

হ্যাঁ আমি মেদিনীপুরের ছেলে । আমি ভেবেছিলাম তুমি  
কপিলদেবের মতন ঋষিকেশ দেব ।

আর আমি ভাবছি পাড়িয়া তো বাঙালী পদবী নয়,দেখ  
আমার সীমিত জ্ঞানের অবস্থা ।

দুজনেই জোরে হেসে ওঠে । মনমরা ঋষি হঠাৎ ভীষণ  
সতেজ । সদ্য বৃষ্টি ধোয়া নবীন ঘাসের মতন ! সেদিন  
বিকেল ওরা প্রথম গেলো ১২০ কিলোমিটার দূরে একটি  
বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশানে । সেখানে ওর বেশির ভাগ নেটের  
বন্ধুদের দেখা পেলো ।

আর অবাক কাণ্ড ওরা সবাই কী ভালো ! এত ভদ্র ও  
মার্জিত যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এরাই আন্তর্জালে এক  
একটি বিচ্ছু মানুষ !

হেসে বলে বিজ্ঞানী বিক্রম দত্ত : আরে বিদেশে এইসব নিয়েই  
বেঁচে আছি !

গালাগালি বাংলায় হলে মন্দ কী ? কারো ক্ষতি তো হচ্ছে না  
!এই দেখ তুই সত্যি যদি আমাদের অপছন্দ করতিস তাহলে  
কি এখানে আমাদের একগাল হেসে স্বাগত জানাতিস ?

: বটেই তো বটেই তো - বলে ওঠে নারায়ণ যে ওদের সঙ্গে  
খুব মিশে গেছে । নারায়ণ নেটে আসেনা অবশ্য । সবাই  
মিলে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে ওরা ছবি তুললো -----  
ফেরার সময় থিস্তিভাস্কর , গালাগালি চুড়ামণি - হাই  
প্রোফাইল এক্সিকিউটিভ কমলিনী এক মুখ হেসে অবশ্য  
বললো : নেটে কিন্তু যুদ্ধং দেহী ! ওখানে আমরা মহিষাসুর  
। আর অন্তরে মা দুর্গার অংশ !

এরা এদের রোজগারের বিরাট অংশ নানান দরিদ্রদের জন্য  
কাজ করা সংস্থায় দান করে দেয় ।

## গণংকার

মোম গাঙ্গীর স্বামী দীনেশ গাঙ্গী একজন ইনোভেটর। অনেক পেটেন্ট আছে ওর। পয়সাও প্রচুর। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে বিলাসবহুল বাড়ি কেনা আছে। বুগাটি চড়ে। স্পোর্টস কার চড়ে। মেয়েটি অবসর সময় পৃথিবীর নানান দেশে ঘুরে ইন্তেলেকচুয়ালদের বক্তৃতা শোনে, নতুন নতুন জিনিস জানা ও জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করে। সম্প্রতি এন আর আইদের একটি পত্রিকাতে এক বিজ্ঞাপন দেখে যায় এক ভারতীয় জ্যোতিষীর ডেরায়। মূলত যায় এর ১০০ পার্সেন্ট ভবিষ্যৎ বাণী ফলানোর কারিকুরি দেখতে। বিজ্ঞাপনে সেরকমই লেখা ছিল কিনা।

দুনিয়ায় কোনো কিছুই ১০০ পার্সেন্ট পারফেক্ট নয়। শুনেছিলো এক ইন্তেলেকচুয়ালের কাছে। জনবসতি ঘেরা ব্যারাক ধরণের এক বাড়িতে হাজির হয় সে। একটু দূরে শফারের হাতে গাড়ি ছেড়ে পদব্রজে পৌঁছায় দরজার কাছে। গণংকার হাসি হাসি মুখে স্বাগত জানায় অন্ধ মোম গাঙ্গীকে। আসলে প্র্যাকটিক্যাল জোকে অভ্যস্ত মোম অন্ধ সেজে

গিয়েছিলো। কিন্তু হল এক মজা! তাকে গুচ্ছের দেবতার ছবি লাগানো ক্যাটক্যাটে কমলা, গোলাপি ও হলুদের এক দমবন্ধ হওয়া চেন্নারে যা এই বিদেশের আবহাওয়ার সাথে বেমানান বসিয়ে গণংকার নানান জিনিস জিজ্ঞেস করতে লাগলো।

মোম বললো : আমি বেকার। গত ১ বছর যাবৎ। নতুন মাইগ্রেণ্ট। জমানো টাকায় চলছিলো, বলুন কবে চাকরি পাবো! ভাড়া বাড়িতে থাকি।

জ্যোতিষী হাতটাত নেড়ে চেড়ে বললো : আপনার তো সমূহ বিপদ সামনে! একাদশে বৃহস্পতি তো নয়ই। প্রায় ফুটপাথে বসতে চলেছেন, ১০০০০ ডলারে নবগ্রহের পুজো দিন নাহলে সাতদিনের মধ্যে গৃহহারা হবেন! বাড়িওয়ালা বার করে দেবেন!

এত টাকার কথা শুনে মোম বলে : আমার হাত তো শূন্য আমি এত টাকা দিতে পারবো না!

জ্যোতিষী, যার নাম স্বামী কর্কটানন্দ বাঁকা হেসে বলে : তাহলে পথে বসুন! টাকার কথা সবসময় ভাবতে নেই! ধার করে পুজোটা করেই ফেলুন! আমাকে বন্ধু ভাবুন! আমি আপনার উপকার করতে চাই, বিদেশে এইভাবে পথে বসবেন একজন নয়নহীনা উদ্ভমহিলা ----- !!

মোম সবিনয়ে জানায় যে টাকা কোনমতেই জোগাড় করা সম্ভব নয়। এবং বিদায় জানিয়ে চলে আসে। কৰ্কটানন্দ অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বলে: তাহলে ফুটপাথই আপনার উপযুক্ত স্থান!

প্রথমেই মোমকে দৃষ্টিহীনা ভেবে তারই সামনে গণৎকার একটি ক্যাবিনেট খোলে। কিছু বই বার করার সময় সে দেখতে পায় যে সেখানে অনেক বন্দুক ও সোনার ইট ভর্তি। ফিরে এসে পুলিশকে জানায় যে এই লোকটি গণৎকারের আড়ালে এক ঠগবাজ! কি করে এরা ভিসা পাচ্ছে??

পরেরদিন জ্যোতিষী স্বামী কৰ্কটানন্দের বাড়ি রেড হয় ও তাকে জেলে পুড়ে দেয় স্থানীয় পুলিশ। খবরের কাগজের হেডলাইন হয়:

ফ্রম রিচেস টু ব্যাগস্ -ইন্ডিয়ান ফ্রডস্টার সোয়ামী কারকাটানান্দা জেলড্, সিজড্ গোল্ড ওয়ার্থ মিলিয়ন্স অ্যান্ড ইলিগ্যাল ফায়ার আর্মস্ ফ্রম হিজ লেকল্যান্ড হোম্।

## ২০১০ পুজো

মেলবোর্নের কাছে একটি বাংলাদেশী দোকানে যাই মাছ কিনতে। মাছ আমার শহরেও পাওয়া যায় কিন্তু ওখানে যাই বাঙালী মাছ যেমন ইলিশ, ট্যাংরা, পোনা এইসব কিনতে। মালিকের নাম হারুন অল রশিদ। এসেছেন বাংলাদেশ থেকে। আমার সঙ্গে বেশ জমে উঠেছিলো। আমি বাচাল নই তবে আলাপী। শুনলাম উনি আমার শহরেও বেড়াতে যান। বললাম: কখনো যাবেন গরীবের কুটিরে। হেসে বললেন: জামু অখন। সময় পাইনা বুঝলেন না!

পুজো এসে গেছে, মাছ কিনতে গেছি। বাড়িতে কিছু অস্ট্রেলিয়ানকে ডেকেছি বেকড্ ইলিশ খাওয়ানো বলে। দোকানে গিয়ে দেখি দোকান বন্ধ। পাশের দোকানে জিজ্ঞেস করতে বললো যে রশিদ সাহেব মারা গেছেন।

-মারা গেছেন! চমকে উঠি, কী শুনছি?

-কি করে? সঙ্গী প্রশ্ন চুঁড়ে দেয়। পাশের দোকানী জ্যারড কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে তারপরে বলে: খুব অদ্ভুত ঘটনা। বোধহয় দুর্ভাগ্য একেই বলে। রশিদ আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে ওখানে গিয়েছিলো। আপনার তো মোবাইল নেই, ল্যান্ডলাইনে ধরতে না পেরে আমাকে ফোন



করে বলে যদি বাই এনি চান্স আপনি এখানে আসেন আমি যেন ওর কথা বলি। তারপর আর কী বলবো বলুন তো। ওয়াইল্ড লাইফ পার্কে গিয়েছিলো সময় কাটাতে। রেমটাইল এনক্লোজারে গিয়ে দেখাছিলো, সাংঘাতিক বিষাক্ত সব সাপ। হঠাৎ একটি ক্যাঙ্গারু ওখানে ঢুকে পড়ে। ওরা ওখানে কাছেই ঘোরাফেরা করে ও সব সময়ই ওখানে ঢুকে পড়ে।

দুটি ক্যাঙ্গারু ঢুকে পড়ে লক্ষ্য বাক্ষর করতে আরম্ভ করে এবং তাতে কাঁচ ভেঙে যায়। বেরিয়ে পড়ে মারাত্মক সব সাপ। রশিদ ছিলো অন্যদিকে। পালাতে গিয়ে ছোবল খায় এবং লুটিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ। একটি জাপানী ছেলে ছিলো। সে কাহ্যদা করে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে। বোধহয় কুংফু-টুংফু শিখেছে। কিন্তু চিরদিনের মতন হারিয়ে যায় হারুণ। পার্কের তরফে গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে ওর পরিবারকে ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, বেশ মোটা পরিমাণে। আপনি জানেন না? কাগজে পড়েন নি?

এখানে তো বাড়িতে রোজ কাগজ দেবার চল নেই, আমরাও কিনি না। আন্তর্জালে খবর পড়ি কখনো সখনো। কাজেই জানতাম না।

সদাশাস্যময়, ঈদের দিনে আমাদের শুভকামনা জানানো, মা দুগ্ধার পুজো দেখতে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনে ঘোরাফেরা করা চনমনে তরুণটিকে আর কোনদিন দেখতে পাবোনা ভেবে ব্যাখ্যায় কেঁপে উঠলো বুক। এক অদ্ভুত কষ্ট আমার

অন্তরে। জ্যারডকে ধন্যবাদ জানাতেও ভুলে গেলাম। মনে হল ২০১০ এর পুজোটা আমার সত্যি বিফলে গেলো।

## গুরুদেব

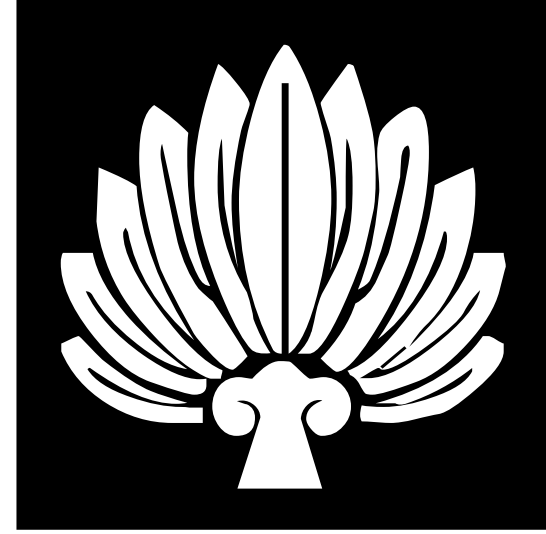
হঠাৎ এক মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে, ভিখারি বাবা। অসাধারণ সাধক। জন্মের আগেই তাঁর মায়ের কানে কানে স্বয়ং কবীর এসে বলে গিয়েছিলেন: বেটি, তোর গর্ভে আমি আবার আসছি।

ঝাক্‌ড়া ঢুল, অটুটি যৌবন। এহেন মহাপুরুষের চেলাচামুন্ডার সংখ্যা স্বভাবতই বেশ বেশী। বেশী ভক্ত আসেন বিদেশ থেকে। বিদেশী সিটিজেন, এন আর আই - --বাবা বাবা --ব্যা-এ-এ-বা --- ছাগলের মতন ব্যা - ব্যা করতে করতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন। তবে বাবার ক্ষমতা আছে। বহু সমাজসেবা করেছেন, ফ্রিতে স্কুল, কলেজ, গরীবদের খাবার বিতরণ আরো যতরকম হয়। কারণ উনি কর্মযোগী। তা কর্মযোগীই বটে। গীতায় বলা আছে এমন কর্ম করবে যা ঈশ্বরের চরণে নিবেদিত। রামকৃষ্ণদেব বলে গেছেন ভগবানে সমর্পিত কর্ম ছাড়া অন্য কর্মের কোনো মূল্য নেই ইত্যাদি কিন্তু বাবাজীর গীতা

আলাদা । উনি লোকের উপকার করেন আবার তার থেকে মাইলেজ নিতেও ছাড়েন না । আর ক্ষমতা না থাকলে ঠানার নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায় ? আন্তর্জাতিক অস্ত্রব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে ইতালিয়ান মাফিয়া যাঁরা ভারতের এক নেত্রীর আত্মীয় বলে বাজারে গুজব আছে কিংবা নেশার বস্তু চরস, গাঁজা , মারিয়ানা ইত্যাদির ডিলার সবাই বাবাজীর কথায় ওঠে বসে । বাবা সমাজসেবার মুখোশের আড়ালে সবকিছুই করেন-ভক্তের কচি কচি শিশুদের যৌন অত্যাচারও । লোকে বলে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের মাফিয়া - আসলে এই ভিখারি বাবার ওপরে সবাই হাড়ে চটা । ভক্তরা অবশ্য এসব বিশ্বাস করেন না । তাঁদের যুক্তি -বাবা খুবই উচ্চস্তরের আত্মা , এগুলো নিন্দুরকের রটনা ।

একদিন বাঁসির আশ্রম থেকে দিল্লী যাচ্ছিলেন । প্রচণ্ড কুয়াশায় গাড়ি দুর্ঘটনা হয় । এক চেলা ও বাবা বেঁচে ছিলেন । অন্যরা সবাই মৃত । দামী এস ইউ ভি একেবারে ন্যাতা হয়ে গেছে চপেট । কোনরকমে দেহ টেনে বার করে দুজনে । চেলা ভগবানের বড় ভক্ত । সমস্ত অঞ্জলি তার নিবেদিত হত ডাইরেক্ট কৃষ্ণকে , বাবাকে নয় । বাবা উপলক্ষ্য মাত্র । দেহরক্ষীর ( মহাপুরুষের শত্রুর অভাব ছিলনা ) হাই এন্ড বন্দুক ক্যালাশনিকভ্ বার করে মৃতপ্রায় বাবার দিকে তাক করে পর পর কচি গুলি ছোড়ে ভক্ত । যখন দেহটা একদম স্থির হয়ে গেলো তখন ভক্তের মুখ থেকে কচি শব্দ বেরোলো -- মর শালো , গরুদেব , হায়

কৃষ্ণ -হায় কেশব আমার অপরাধ ক্ষমা করো , হিন্দু ধর্মে গো-হত্যা পাপ , কিন্তু আমার আর উপায় ছিলনা !



## কবি স্ক্যাম

কবি পলাশবরণ দাস খুব নাম করেছেন বাংলায়। সবাই বলেন : প-দা। নতুন ধরণের কবিতা যা সুরের মতন করে লেখা তা লিখে উনি দারুণ জনপ্রিয়। সেই কবিতা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে, নাম ঝাপাং ঝাপাং। ঔঁর কবিতা পড়লে মনে হয় যেন গান অপেক্ষা করে আছে উড়ে যাবার -এতই সুরেলা। আধুনিক কিংবা অত্যাধুনিক কবিতা তাঁর একেবারেই না পসন্দ। যাঁরা ওর রচয়িতা তাঁরা সবাই বদ্ধ উন্মাদ, প-দার মতে। নিন্দুকের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই। তাঁরা বলে : ধুস্ শালা গানই যদি শুনতে হয় ক্যাসেট কিনে শুনবো ঔঁর কবিতা পড়বো কেন?

কবির খুব বিদেশে যান। এন আর আইরা তাঁকে নিয়ে যান। তাঁদের বাড়ি থেকে খেয়ে সাহিত্য সভা করে ফিরে আসেন। বদলে তাঁরা কলকাতায় এলে ঔঁর বাড়িতে থাকেন। অবশ্যই যাঁদের কলকাতায় বাড়ি নেই। যাঁদের আছে তাঁরাও থাকতে পারেন কারণ কবির বাড়ি বেশ বড়। অট্টালিকার মতন। বাঙালী কবি লেখকদের তো এত পয়সা হয়না! বোঝাই যাম্ছে ইনি খুবই জনপ্রিয়, বইয়ের বাজারে। সদাহাস্যময়, নম্র, নবীন কবিকে প্রতি নমস্কার করা এই

প-দা কে একদিন হঠাৎ পুলিশ হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গেলো। সবাই চমকে উঠলো!

যাক্কাবা! হল কী?

পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই বিষয়ে খবর:

কবি পলাশবরণ দাস, বাড়িতে এন আর আইদের তুলে বেডরুমে ও বাথরুমে গুপ্ত ক্যামেরা ফিট করে নোংরা ছবি তুলতেন। তারপর সেইসব ছবি চড়া দামে আন্তর্জালের মাধ্যমে পর্ণো সাইটে বিক্রি করতেন। এক এন আর আই ঔঁর বাড়ি উঠেছিলেন। সেখানকার কিছু রঙীন মুহূর্ত একদিন উনি একটি পর্ণোসাইটে দেখতে পান। দুইয়ে দুইয়ে চার করতে সময় লাগেনি। এবং তাঁর অভিযোগ পেয়ে কবির জেলের ঘানি টানছেন।

খবরটি পড়ে পলাশ বরণের ভক্তদের মুখ সত্যিই পলাশ বরণ হয়ে গেলো।

## চন্দ্রমল্লিকার জন্য

দুর্গা পুজো এসেছে। বড় বড় প্যাভেল, আলোর রোশনাই, মৃন্ময়ী আর চিন্ময়ী, খাটো স্কার্ট, ব্লাউজ - উপরি পাওনা ক্রিভেজ সমস্ত কিছুর এক অদ্ভুত সুন্দর মিলন ক্ষেত্র এই পুজোগুলি।

ফুটপাথের বাসিন্দা ও গরীব মানুষের হাহাকার ছাপিয়ে এক একটি পুজো প্যাভেল যেন বলতে চাইছে : দেখো আমায় দেখো। আমরা গরীব নই। অর্থের স্রোতে বয়ে যাচ্ছে দুঃখ। না পাওয়ার কষ্ট।

ঐন্দ্রিলা দত্ত। সাউথ পয়েন্টের ব্যাকবেঞ্চর। পাস কোর্সে বি-এ পাশ। সন্তোষপুরের মেসে থাকা এক গৈর্যো ইঞ্জিনিয়ারের গলায় বুলে পড়েছিলো। গ্রামীণ ইঞ্জিনিয়ার শহুরে মডের প্রেমতীরে বিদ্ধ। ফর ফর করে ইংরেজি বলে - দাঁত কিড়মিড় করে ইংরেজি গান গায় ---গোলাপি লিপস্টিক লাগিয়ে, রোদচশমা ঐটে একেবারে ঐশ্বর্য রাই। বিয়ে হয়ে গেলো। একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিলো। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পাড়ি দিলো ম্যারিকা অর্থাৎ অ্যামেরিকা। এই ২০১০ এ পুজো দেখতে কলকাতা এসেছেন সপরিবারে। আসা অবধি বিদেশের গুণগান ও

ভারতের বদনাম, ঐন্দ্রিলার মুখে যা শুনে শুনে সবাই ভাবছেন : কি হনু! আপদ বিদায় হলেই বাঁচা যায়।

যোধপুর পার্ক পুজো প্যাভেলে ঢোকা দায়! এবার এই পুজোটাই সব থেকে চিত্তাকর্ষক বলছেন মিডিয়ার মানুষ। ছেলেকে ওর প্রিয় ফুল মামস্ অর্থাৎ ক্রিসেখিমামস্ কিনে দিয়েছেন। ছেলে খুব খুশি। বাবা-মায়ের হাত ছাড়িয়ে কোথায় ঢুকে পড়েছে।

প্যাভেলের পেছনে হঠাৎ এক ব্যক্তিকে দেখা গেলো। প্রচুর আর ডি এক্স নিয়ে এসেছেন, দেখে মনে হচ্ছে ফলের বাস্কেট। বিস্ফোরণ হবে! মাওবাদীরা ধ্বংস করে দেবে এই প্যাভেল। কারণ একটা চেতনা যাঁকে কেউ কোনদিন দেখেনি তাঁর পুজোর নামে এত অর্থ ব্যয় হচ্ছে, এদিকে গরীব মানুষ খেতে পাচ্ছে না।

অগ্নিসংযোগ করতে উদ্যত হল ৬৭৮। কোড নেম। এমন সময় ওদের হেড হঠাৎ হাতের ইশারায় থামতে বললেন। কারণ একটি বাচ্চা ছেলে যে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো এবার কাছে এসে বললো : মাও জেঠু মাও জেঠু এই মামস্ ফুলটা নাও আর সবাইকে ছেড়ে দাও। আমার কাছে এখন তো কিছু নেই, ইউ এস এ ফিরে গিয়ে বাবাকে বলবো গরীবদের জন্য ডলার পাঠাতে। আমি অনেক দূর থেকে এসেছি পুজো দেখতে। আমাকে প্রমিস করো জেঠু।

তুমি দুর্গা হতে চাওনা কেন? কেন মহিষাসুর হতে চাও গো?

শিশুর সরল কটি কথায় মাওবাদের হৃদয়ে বুঝি দয়ার উদ্বেক হল। ক্যাজুয়্যাল ভঙ্গীতে চন্দ্রমল্লিকার মিষ্টি সুবাস নিতে নিতে তারা মিলিয়ে গেলো পুজোর হাওয়ায়।

## দাতা কর্ণ

ইট ওয়াজ মাই প্রিন্সিপাল রিলেশনশিপ। আই মিস হার আলটি।

বলেই মুখে একটি দুঃখ দুঃখ ভাব এনে মুখ ঘুরিয়ে বসলেন বিখ্যাত অভিনেতা অভিনব অগ্নিহোত্রী। কথা হচ্ছিলো শোয়ের ফাঁকে ফাঁকে। এক গ্ল্যামার গার্লের বিষয়ে কথা হচ্ছিল যিনি সম্প্রতি আত্মহত্যা করেছেন। এই রিয়েলিটি শোতে অভিনব বিশেষ অতিথি। কয়েকটি গেম খেলবেন। জিতলে কোটিটাকা পাবেন।

যথা সময় শুরু হল খেলা। অভিনবের বিদেশে গ্যাম্বলিং করে অভ্যাস আছে।

ওখানে গ্যাম্বলিং খুব সিস্টেমটিক। বহুবার উনি জিতেছেন তাই এই খেলায় ভাগ নিয়েছেন। খেলা শেষে দেখা গেলো উনি ১ কোটি টাকা পেয়েছেন। কিন্তু অপূর্ব মানুষ

অগ্নিহোত্রী। পুরো টাকাটাই দান করে দিলেন একটি মহিলা সংস্থাকে যাঁরা দুস্থ, বিকলাঙ্গ মেয়েদের হয়ে কাজ করে। এই তো দীপাবলির সময়, একটি ভালো কাজ করে মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করলেন।

খেলা শেষে পর্দার অন্তরালে দুই চ্যানেল কর্মীর বাক্যালাপ:

নিলেন চ্যানেল থেকে ৫ কোটি। তার মধ্যে থেকে মাত্র ১ কোটি জেতার ভান করে দান করে দিলেন! লোকে আবার এগুলো বিশ্বাসও করে!

কলির ডিজিট্যাল দাতা কর্ণ একেবারে!

## ভয়

রুকসানা মোবাইল অফ করে নরম সোফায় ধপ্ করে বসে পড়লো । পাশে রাখা এক গুচ্ছ তাজা পদ্ম । পদ্ম নিজের বাগানের । ঘর সাজিয়েছিলো বেন আসবে বলে । বেন ওরফে বেঞ্জামিন ওর কোম্পানির চিফ ম্যানেজার । যার প্রেমে রুকসানা পাগল । ৪৬ বছরের বেন কিন্তু রুকসানাকে বিন্দুমাত্র পাত্তা দেয় না । রুকসানার বাবা হানিফ সাহেবের এই কোম্পানি বিভিন্ন তত্ত্ব থেকে নানান দ্রব্য তৈরি করে । বিদেশে রপ্তানি করে । হায়দ্রাবাদ শহরের বেশ নামী ব্যবসাদার । অভিজাত । হাই প্রোফাইল । সংস্কারমুগ্ধ ।

বেন অ্যাংলো । আই আই এম ।

তুখোড় ম্যানেজার । বি স্কুল জার্গন মানে না । নিজের নিয়ম নিজেই বানায় ।

মালিকের মেয়ে হলেও রুকসানা একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে এই কোম্পানিতে কাজ নিয়েছে । ও ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি । কাজ করে বেনের তত্ত্বাবধানে । অদ্ভুত এক মায়াজালে আবদ্ধ সে বেনের সঙ্গে মনে মনে । কিন্তু অপর পক্ষ তাকে ক্রমাগত হ্যারাস করে , গালাগালি দেয় ।

প্রচুর খাটায় । মালিকের মেয়ে , ধনীর দুলালী বলে ব্যঙ্গও করে ।

তবুও রুকসানা বেনকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনা । ওর বাদামী চামড়া , পুরুষ্ঠ ঠোঁট , মেল শ্যুভিনিজম ---- সমস্ত ভালো আর খারাপ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় রুকসানার কাছে । শবরের প্রতিষ্ঠা নিয়ে বসে থাকে সে । আজ বুঝি সেই প্রতিষ্ঠার অবসান হল ।

বেন আর নেই । সে মৃত । রুকসানাকে বাঁচাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে । পুরো শরীর ভস্মীভূত হয়ে গেছে । ভেবেছিলো রুকসানা অফিসেই আছে । ঘরে আগুন দেখে ছুটে যায় ।

কিন্তু তার কিছু আগেই রুকসানা চলে এসেছিলো । বেনের যে আজ সন্ধ্যায় আসার কথা তার বাড়ি । আসার কথা কাজেই । তবুও-----

পারলৌকিক ক্রিয়ার দিন সাদা শাড়িতে অসম্ভব শূকনো লাগছিলো রুকসানাকে ।

চার্চ থেকে বেরিয়ে রোজমেরী গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলো । ছুটে এলো পারিজাত । আরেক অফিস কলিগ । কিছু কথার পরে বলে উঠলো : বেন তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসতো রুকি । আমাকে বলেছিলো । কিন্তু তুমি মালিকের মেয়ে । যদি তোমার বাবা কিছু ভেবে বসেন তাই

দূরত্ব বজায় রাখতে নিজেকে কঠোর ও ক্ষমাহীন রূপে তোমার সামনে হাজির করতো ।

মুহুর্তের দুর্বলতায় যেন তুমি ছোট হয়ে না যাও তোমার পরিবাবের কাছে । তোমরা ওর অল্পদাতা । তোমরা অভিজাত বংশ । ও তো অনাথ আশ্রমে প্রতিপালিত । বাবা মায়ের কোনো ঠিক নেই । তাই নিজেকে মেলে ধরতে খুব ভয় পেতো ।

## লন্ঠন অভিযান

মাউন্ট ইয়ারাইয়ারায় বহু খুন খারাপীর ইতিহাস আছে । নিয়মিত ঘোন্ট ট্যুর হয় । কোনোটা ঘোড়ার গাড়িতে কোনোটা বা পায়ে হেঁটে হাতে লন্ঠন নিয়ে । এরকমই এক ট্যুরের বাঙালী গাইড প্রতীশ সাহা । ছেলেবেলা থেকে প্রতাপ্রেমী । তবুও কোনোদিন প্রতাত্মা দেখেননি । গ্রীষ্মের অমানিশায় লন্ঠন অভিযানে উনি পথপ্রদর্শক । পেছনে টুরিস্টরা । এক এক করে সাতটি ভৌতিক স্থান পরিদর্শন করে গল্প বলতে থাকেন প্রতীশ । শেষ মাইলস্টোনে এসে পেছন ঘুরে দেখেন উনি একা আর কেউ নেই ! পরদিন প্রভাতে খুঁজে পাওয়া যায় সাত টুরিস্টের লাশ ফেলে আসা সাতটি ঘোন্ট হ্যান্ডিং স্পটে ।

যেন কেউ অমানুষিক ভাবে খুন করেছে তাঁদের ।

## ডালিম চাষ

মুক্তনাথ শনিসম্মাট খুব বড় জ্যোতিষী শুনে কুণ্ঠি করতে গিয়েছিলেন রমা সেন। একটি ঠিকুজি করতে নিলেন নগদ বারো হাজার টাকা। *এরকমই নেন* - বললেন পরাগ পাকড়াশী। অনেকেই করান। জেট যুগে খুব কম সময়ে হয়ে যায়। নিখুঁত ছক, অর্ন্তদশা, মহাদশা, গজকেশরি, দারিদ্র্য, বুধাদিত্য যোগ ফোগ সহ একেবারে। অসম্ভব জনপ্রিয় এই অ্যাস্ট্রোলজার। অন্যদিকে বাজারের নামী নাযিকা পার্শ্বমিতা দত্ত চৌধুরী গুপ্ত। সংক্ষেপে পার্স। ঘ্যামা দেখতে। সব ছবি সুপার ডুপার হিট। স্বপন সাহা, হিহির হাহা, অভিনব চট্টরাজ সিংহ, মন্মিতা কাপাড়ি সমস্ত পরিচালকের সাথে কাজ করেছেন। দুর্দান্ত হিরোইন। বাজারদর আকাশ ছোঁয়া। শুধু *ডিম্পি চ্যানেলকে* সাক্ষাৎকার দেন। অন্যত্র দেন না। কেউ আজ অবধি সামনা সামনি দেখেনি ওকে। কোনো দুঁদে সাংবাদিকও নন। ওর জন্যে কত না ভক্ত সুইসাইড করেছেন। ডিপ্ৰেশানে চলে গেছেন।

আজকাল ডালিমের খুব দাম। ডালিমের রস খেয়েছো? মিঠে একটা সুবাস আছে। আজকাল আমি ডালিম চাষ করছি আমার কোম্পানিতে।

--বলেন নাগাধিরাজ সেন।

ডিম্পি এন্টারটেনমেন্ট ও ডিম্পি ওয়েব চ্যানেলের কর্ণধার।

একটি সিনেমা বানায় অন্যটি হাই ফাই পোর্টাল। আছে জ্যোতিষ থেকে খুচরো বাজার অবধি সব। শুধু একটি বোতামের দূরত্ব।

পার্শ্বমিতা কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজ অর্থাৎ অ্যানিমেটেড ক্যারেক্টার। আর হাই ফাই জ্যোতিষী মুক্তনাথ আদতে অস্ট্রোলজারই নন। উনি সাধারণ মানুষ যিনি একটি সফটওয়্যার নিয়ে বসে জন্ম তারিখ ও সময়, জন্মস্থান এইসব ডেটা মেশিনে ভরে ঠিকুজি তৈরি করে দেন অল্প সময়ে। নেন নগদ ১২০০০ টাকা। এই সাইবার হাটে বাজারে।



## লাভ

পাড়ার এই ছোট্ট চায়ের দোকানে বসে সময় কাটায় রঘু । আর আলোচনা করে এক বয়স্ক ব্যক্তির সাথে একটি উপন্যাস নিয়ে । উপন্যাসটি বেশ উপাদেয় । আমেরিকার প্রথম কালো রাষ্ট্রনেতাকে নিয়ে লেখা । মজার ব্যাপার হল লেখক কোনোদিন আমেরিকা যাননি অথচ নিপুন তুলিতে ঐকেছেন সেই দেশের সামাজিক চিত্র । এরকম তুলনামূলক কল্পনার অধিকারী যেই লেখক তাঁকে দেখার একটিবারের সাধ রঘুর ।

ঐর লেখা পড়তে পায় আন্তর্জালের কৃপায় । আজকাল বাজারের জনপ্রিয় লেখক হেমন পাল লেখেন মধ্যবিত্ত সমাজের প্যানপ্যানে গল্প । তার রক্ষিতা দময়ন্তী নন্দ । লোকে বলে : ডমে আন্টি । কারণ মহিলাটি লেখকের চেয়ে পাক্কা ২০ বছরের বড় । আগের পক্ষের দুই প্রায় যুবক সন্তান ও স্বামীকে ছেড়ে এসে লেখকের সাথে থাকেন ।

পেশায় সেলাই শিক্ষক । বাড়িতে সেলাই শেখান ও অবসরে বাংলা ফোরামে বসে আই আই টিয়ানদের সাথে তর্ক করেন , ভার্চুয়াল জগতে বসে ফোরামের লেখকদের ম্যাচুরিটির পরিমাপ করেন ও ফ্রিতে জ্ঞান বিতরণ করেন ।

কতকটা তারই জন্য বিদেশে বিখ্যাত হেমন পাল । হেমন ব্লগ লেখেন । সেই প্যানপ্যানে যতসব গল্প ।

-আজকালকার লেখকগুলোর যা স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে না ! বলে তাকায় বৃদ্ধের দিকে ।

উনি হাসেন । তারপর মৃদুভাষী মানুষটি বলে ওঠেন : আমরা গভীরতা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি । শুধু লেখক কেন ? বাংলায় সমস্ত কিছুই নিম্নগামী । আস্তে আস্তে এটা মারোয়ারি ও গুজরাটিদের ডেরা হয়ে যাবে । ভালো বাঙালীরা সবাই বিদেশে ও অন্য প্রদেশে ।

মানুষটি বেশ থেকে উঠে হেঁটে হেঁটে চলে গেলেন লেকের ওপাড়ে । আকাশে অস্তরাগের আলো । এমন সময় এলেন আরেক ক্রেতা । সুবিমল বাবু । আজকাল এর লেখা মহাজাগতিকদেশ পত্রিকায় বার হয় । ধরপাকড়ের রাস্তা ভালই জানেন । আসলে মহাজাগতিকদেশ ফেশ তো কেউ কেনেই না আজকাল ওদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টেই লেখা আছে সেসব , তাই গোবর ঘুঁটে যা খুশি ছাপা হয় ।

হস্ত দত্ত হয়ে এসে বললেন : উনি কোথায় ? কোনদিকে গেলেন ?

বিস্মিত হয়ে রঘু বলে : কে ? কাকে খুঁজছেন ?

লেখক যতীন্দ্র নারায়ণ দে ? লাভ উপন্যাসের রচয়িতা । ঔর সাথে আমার লেটেস্ট নভেলটা নিয়ে কিছু আলোচনা

করার ছিলো। আমিই হেমন পাল ছদ্মনামে একটু আধটু লিখি টিথি, শুনেছেন নিশ্চয়ই আমার নাম! হে হে!

একটু রাগত স্বরে বলে ওঠে রঘু : না শুনে উপায় আছে? আপনার পি আর এজেন্ট ডমে আন্টি কি না শুনিয়ে ছাড়বেন? তা এবার কি গদ্যগন্ধর্ব অ্যাকাডেমি না সোজা জ্ঞানেন্দ্রনিবাসপীঠ। যাক্ একদিন লোককে বলতে পারবো, এমন একজনকে একদিন চিনতাম যিনি জ্ঞানেন্দ্রনিবাসপীঠ পেয়েছিলেন।

## গসিপ

সারা ক্লাস ইউ-টিউবে দেখেছে রূপসী প্রফেসর শিরিন বাত্রার যোনি চিত্র। এই মিসের জন্য পাগল শতাধিক ছাত্র। মাত্র ১৮/১৯/২০ বছরের ছাত্ররা ক্লাসের পরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা এই মিসের জন্যেই। এক দল তো মিসের স্বামীকে কিডন্যাপ করার প্ল্যানও করেছিলো। শেষে গাইনিকে অর্থ প্রদান করে মোবাইলে তুলে এনেছে যোনিচিত্র। যা এখন সারা বিশ্বের দর্শকের দেখার বস্তু। এবং গসিপের-ও, সমস্ত ছাত্রদের। অর্থের লোভে মেডিক্যাল এথিকস্কে বুড়ো আঙুল দেখানো চিকিৎসক বলেছেন - আরে মশাই এ হল ঘোর কলি! বাবা মেয়েকে আর মা ছেলেকে রেপ করে দিচ্ছে! সেখানে আমারটা কি খুব বড় অপরাধ??

**কঠিন প্রশ্ন!**

## বডিগার্ড

নর্তকী মিশমি ঘোষকে আজকাল বডিগার্ড হায়ার করতে হয়েছে। ওর নাচকে লোকে বলে আইটেম সং। তাই একদল মানুষ তাকে উত্যক্ত করতে আরম্ভ করেছে। কিছু stalker আছে। নাচের আসরে আক্রান্ত মিশমি। ফিমেল বডিগার্ডের দেহ চুরমার -মিশে গেছে ধুলায়। তবুও মিশমিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে সে।

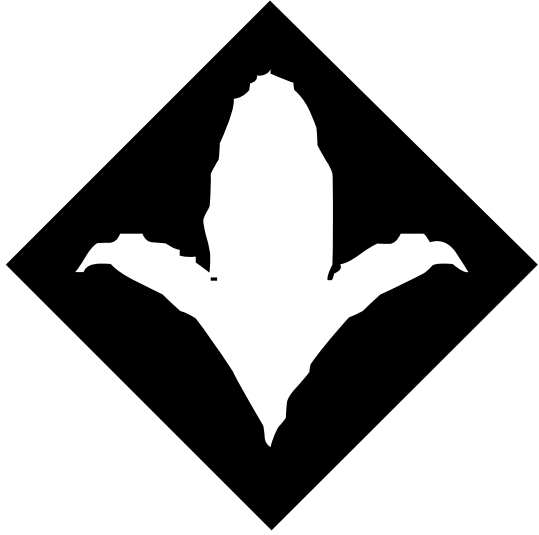
রাতে আনন্দ উৎসবে বডিগার্ড সশরীরে হাজির। আসলে সে এক অত্যাধুনিক রোবট।

যাকে দেখতে মানুষের মতন, আচার ব্যবহারও সেরকম।

## আত্মা

শেখরের বড্ড লেখক হবার শখ। শৈশবে মা কে হারিয়েছে। বাবা আর বিয়ে করেন নি। একা হাতে তাকে মানুষ করেছেন। একলা সময়টা কাটাতো সে প্লাঁশেং করে। একদিন সে লেখা জমা দিলো নামী পত্রিকায়। খুবই প্রশংসিত হল। ক্রমশ তার নাম হল। লোকেরা বললেন : সে মার্ক টোয়েনের উত্তরসূরী। তার রচনা একেবারে মার্কের মতন। উডলন সিমেটারিতে মার্ক টোয়েনের সমাধিতে বসে মুচকি হাসে শেখর মাতঙ্গকর। কাউকে আজও বলেনি যে প্লাঁশেং করে সে মার্ক টোয়েনকেই ডাকতো। পরে হত অটোমেটিক রাইটিং, প্রখ্যাত এই ভাস্মাখপতির কল্যাণেই।

**Note: Automatic writing or psychography** is writing which the writer states to be produced from a subconscious and/or spiritual source without conscious awareness of the content. In spiritism, spirits are claimed to take control of the hand of a medium to write messages, letters, and even entire books. Automatic writing can happen in a trance or waking state... Wikipedia.



## ভ্রূণ

শালবনী থাকতো শালডুংরীর কাছে । ডাক্তারি পাশ করে এখানেই খুলেছে মোটামুটি মাঝারি আকারের হাসপাতাল । আজকাল সে এক অদ্ভুত ব্যবসা ফেঁদে বসেছে । এখন তো অনেক অবিবাহিতা মেয়ে মা হয়ে যায় , সে তার হাসপাতালে তাদের ভর্তি করে গর্ভপাত করায় । এইভাবে বহু মানুষ তার হাসপাতালে গর্ভপাত করিয়েছে । নিয়মিত নানান চিকিৎসার সাথে সাথে চলেছে এই গর্ভপাত খেলা ।

শালবনী বিয়ে করেছে এক গুজরাটি ব্যবসাদারকে । কাজেই টাকার অভাব নেই । ইদানিং তারা কন্টিনেন্ট ট্যুরে যাওয়া আরম্ভ করেছে । কিছুদিন আগে ঘুরে এসেছে এক মরুশহর থেকে । সেখানে এক উটপালক মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয় । মেয়েটি শালবনীকে একটি পুতুল উপহার দিয়েছিলো । পুতুলটি রয়েছে হাসপাতালে । রিসেপশানে ।

পুতুলটি আসার পর থেকেই হাসপাতালে শুরু হয়েছে খুন খারাপি । আগে ভ্রূণ হত্যা করা হলে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যেতো না । এখন দেখা যাচ্ছে যে রোগিনী শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছেন । কে এই খুনগুলি করছে বোঝা যাচ্ছে না । হাসপাতালের কয়েকজন নাইটিডিউটি দেওয়া কর্মী অবশ্য বলছেন যে তারা ঐ পুতুলকে হেঁটে গিয়ে রোগিনীর গলা

টিপে মারতে দেখেছেন। হাত লম্বা করে গলা টিপে ধরে শ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে ক্ষুদ্র নিজীব পুতুল! ২০১৯ সালে এ কি বিশ্বাস যোগ্য??

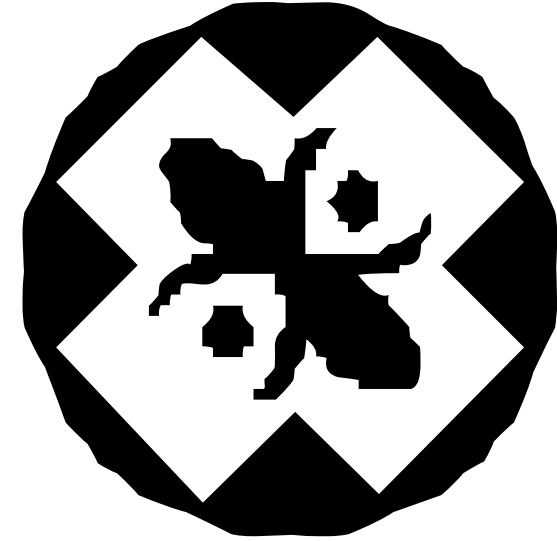
কেন নয়? মহাবিশ্ব মায়াময়। কী করে কী হয়ে কে জানে? অণু পরমাণুর খেলাই দেখা না। কোয়ান্টাম জাম্পিং-এর কথা জানানো? একই প্রিন্সেস ডায়ানা একসঙ্গে বিভিন্ন মহাবিশ্বে অবস্থান করছেন। এ তো বিজ্ঞানই বলছে! তুমি একবার খোঁজ নাও না। বলেন বৃদ্ধ ডাক্তার ডঃ তোলারাম।

শালবনী পুতুলটিকে কিছুদিনের মতন তার বাড়িতে ঠাকুরঘরে রেখে চলে যায় মরুশহর হাফিদাতে। হাফিদা শহরে যাযাবর শ্রেণী ডোরারাহা আপাতত বাস করছে। তাদেরই মেয়ে সেই উটপালিকা। মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিলো। কারণ তার প্রেমিকের সঙ্গে তার একটি সন্তান হয় যাকে দলের লোকেরা গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় মেরে ফেলে।

তারপর থেকে সে যেন ক্রোধী হয়ে ওঠে। কোথাও কেউ গর্ভপাত ঘটালেই সংশ্লিষ্ট লোকদের কঠিন সাজা দেয়। কখনো মেরে কখনো পঙ্কু করে। যার যেমন দোষ তার সাজার পরিমাণও সেরকম। অনাঙ্কত সন্তানের প্রাণ নেবার অধিকার তার বাবা মায়েরও নেই। সে আসছে নিজের যোগ্যতায়, ভাগ্যের খেলায়। কাজে কাজেই-----

শালবনী স্থির করেছে ফিরে গিয়ে গর্ভপাতের বিভাগটি তুলে দেবে। ফেরার পরে দেখে কোনো অজ্ঞাত কারণে

ঠাকুর ঘরে পুতুলটির মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে ও সে পড়ে আছে এককোণায় একতাল পরিত্যক্ত কাপড়ের মতন। হয়ত শালবনীর নেওয়া ডিসিশানের কথা সে শুনতে পেয়েছে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে!



## মিশেল

ঈশিতা বেশ কিছুদিন হল বিদেশে এসেছে। স্বামী সুচাকুরে। একটি পৃথিবী বিখ্যাত শহরে এসে উঠেছে। সাব আর্বান এরিয়ায় বাড়ি ভাড়া করে বসবাস করছে। মাসখানেক কেটে যাওয়াতে বাড়িতে ক্লিনিং সার্ভিস থেকে লোক আনিয়েছে ঘর দোর সাফ করার জন্য। উইক এন্ডে ওরা বেশি টাকা নেয়। উইক ডে-তে ডাকা হয়েছে। ঈশিতা এখন বাড়িতেই থাকে। চাকরি পায়নি। পেশাগত দিক থেকে সে একজন স্কুল শিক্ষিকা। এম -এড পাশ করে এসেছে দেশ থেকে। বাড়ির চাকরানী মিশেল এলো একটু বেলা করেই। মিনিট ২০ দেরী দেখে ঈশিতা একটু বকাঝকাও করলো। কাজের সময় একটু বেশি তদারকি করছিলো।

মিশেল বেশ গুছিয়ে কাজ করলো। পরিপাটি কাজ। যত্ন করে করা।

আপনার বাড়িটা বেশ পরিষ্কার। সাধারণত: ভারতীয়দের বাড়িতে ঢুকলেই একটা স্পাইসি গন্ধ নাকে আসে। আপনার উনুনটিও বেশ ঝকঝকে। আপনারা ও ইতালিয়ানরা খুব তৈলাক্ত জিনিস রান্না করেন।

মিশেলের গলার আওয়াজ ও কথা বলার ভঙ্গিমা ভারি সুন্দর।

ঈশিতা একটু বেশি খ্যাঁক খ্যাঁক করছিলো।

শেষে দেখলো বেশ ভালো কাজের হাত।

যাবার সময় নগদ ৪০ ডলার এক ঘন্টার জন্য, নিয়ে গেলো। একটা কার্ডও দিয়ে গেলো। তাতে যা লেখা তাই না দেখে ঈশিতার চক্ষু চড়ক গাছ। নিজের ব্যবহারের জন্য বেশ লজ্জা লাগছিলো। তার থেকে অনেক বেশি কোয়ালিফায়েড একজন এসে তার ঘর, টয়লেট, কিচেন সব সাফ করে দিয়ে গেলো, হাসি মুখে। কর্ম সংস্কৃতি একেই বলে। কোনো কাজই ছোট নয়, হেলাফেলার নয়।

কাজের লোক মিশেল একজন কোয়ালিফায়েড চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজের ট্যাক্স ও বিজনেস কনসালটেন্সি ফর্ম আছে। এছাড়াও ক্লিনিং সার্ভিস চালায়।

## খুনি মেয়ে

-এটা পৈদোফাইলদের জেল । গ্রেসকে এখানে অল্পদিনের জন্যে আনা হয়েছে । ভরাট গলায় বলে উঠলেন জেলার , যোসেফ ল্যাল ল্যাল ।

ড: প্রবাল গুপ্ত এসেছেন জেল পরিদ্রমণে । উনি সমাজ বিজ্ঞানী । ভারত থেকে বিদেশে এসেছিলেন গবেষণার কাজে । এখন অপরাধীদের পড়ান । তাদের মধ্যে যারা মেধাবী সেইসব অপরাধীকে উনি বিশেষ কাউনসেলিং করে কোনো না কোনো শাখায় ঢুকিয়ে দেন যাতে তারা মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারে । বিদেশে এই বেশ সুবিধে । এগুলি কোনো সোস্যাল ট্যাবু নয় ।

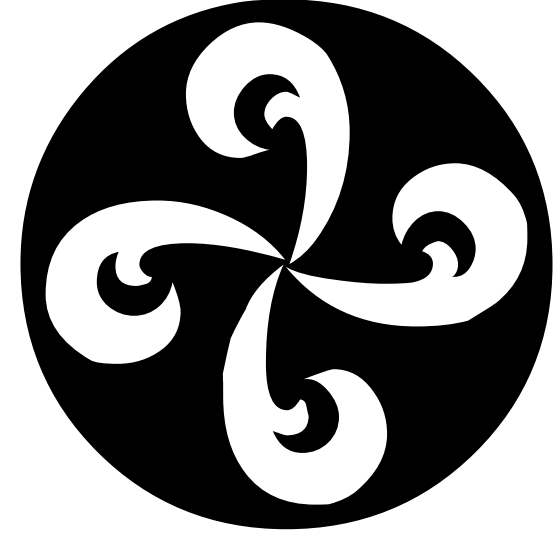
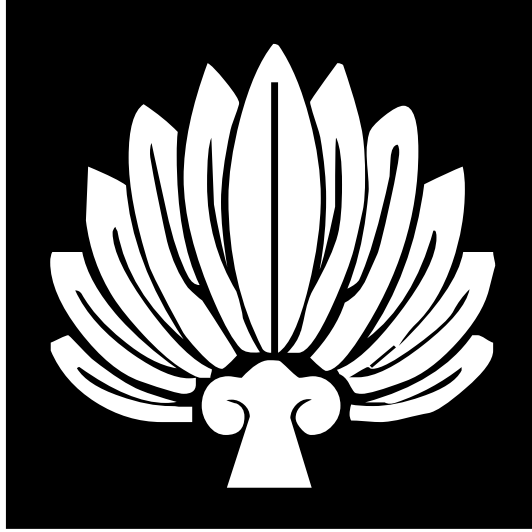
পুরুষ পৈদোফাইলদের জেলে একটি মেয়ে রয়েছে । একা । মেয়েটি মিতভাষী । স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি । আজ পর্যন্ত কোনো অপরাধীকে উনি সোজাসুজি চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে দেখেন নি । এই মেয়েটি অন্যরকম ।

বাড়ি ফিরে রোজ রাতে তলস্তয়ের রেজারেকশান নিয়ে বসেন প্রবাল । এলোমেলো পাতা উল্টান । তার প্রিয় গল্প । ভীষণ প্রিয় । উনি অকৃতদার । বিয়ে করেন নি । বয়স মধ্য ৪০ ।

উনি কেন বিয়ে করেন নি তার কারণটি খুব অদ্ভুত । লোকে শুনলে পাগল ভাবতে পারে । উনি ভালোবাসতে চেয়েছিলেন এক কয়েদীকে । কিন্তু সেরকম কয়েদী মেলা ভার । কাজেই অবিবাহিত আছেন । মেয়েটি বোধকরি ২৭ - ২৮ হবে । অন্য জেলে স্থানান্তরিত করার আগে উনি সময় চাইলেন । বললেন : আমি একটু কথা বলতে চাই । ওর ওপরে গবেষণা করতে চাই । অনুমতি মিললো । কথা বলে জানা গেলো মেয়েটির স্বামী মদ্যপ ছিলো । মদের নেশায় একদিন ওকে মারতে এলে ধস্তাধস্তিতে ওর হাতের সবজি কাটার ছুরি ঢুকে যায় লোকটির গলায় । সে মারা যায় । মেয়েটি খুনের দায়ে জেলে ছিলো । কিন্তু আত্মরক্ষার খাতিরে বলে কম সাজা হয় । এখন সে ছাড়া পেয়েছে । কিন্তু বাইরের জগৎ তার সহ্য হচ্ছে না । জেলের ভেতরটাই বেশ লাগছে । তাই সে আবার কয়েদখানায় বন্দি হতে চায় । যেখানে ছিলো সেখানে নতুন কয়েদীকে রাখতে হবে বলে জায়গা খালি না থাকায়- এখানে আপাতত: আনা হয়েছে ।

রেজারেকশানের কাটুশার মতন মোটেই নয় ! তবুও মাধুরী ছড়ায় । স্বপ্ন মাথা নিশ্চুতি রাত আন্দোলিত প্রেম সুবাসে । গ্রেসের হাতে ড: গুপ্তর হাত । ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে চাঁদ ডুবে যায় কয়েদখানার চূড়া থেকে ইন্টেলিজেন্সিয়ায় ।

প্রবাল গুপ্ত তাঁর জীবনে , প্রিয় গল্প রেজারেকশানকে  
সেলিব্রেট করতে চলেছেন । প্রেসের কাছে আর হয়ত  
ফেটিশ নয় , কয়েদখানাটা ।



## গাইড

বহুদিন ধরেই ঘোস্ট হান্টিং ট্যুরে যাবার ইচ্ছে কিন্তু বৃষ্টি  
বাদলার জন্যে হয়ে উঠছিলো না ।

বর্ষা কমতেই হাজির আমরা এক সন্ধ্যায় ভূত দর্শনে ।  
আমাদের গাইড পিটার । পিটার ওবামা । হ্যাঁ বারাক নয়  
পিটার ওবামা । মূলত অ্যাফ্রিকান । ঘন কালো রঙ । মাথায়  
ঝাকড়া চুল ।



এক মনে বলে চলেছে বিভিন্ন ভৌতিক স্থানের গল্প ।  
কোথায় কবে কীভাবে ভূত দেখা গিয়েছিলো বা যায় এইসব  
। বললো : যারা বেশি সংবেদনশীল তারা ভূত দেখতে পায়  
বেশি ।

ওদেরও নিজের জগৎ আছে , নিয়ম কানুন আছে তাই  
সবাই সেই দুনিয়ায় প্রবেশাধিকার পাননা । এত জ্ঞানী যে  
ভাবা যায়না । স্টিফেন হকিং থেকে আইনস্টাইন আবার  
রিচার্ড ডকিন্স থেকে বৌদ্ধ দর্শন --পুরো মুখস্থ । মানুষ  
কতরকমভাবে জীবন কাটায় । কেউ বাঁচেন বিজ্ঞানের  
ছত্রছায়ায় কেউ অতীন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে । বহুবার সে  
ভূতের হাতে নাস্তানবুদ হয়েছে কিন্তু নিখুঁত টাইমিং ও  
অভিজ্ঞতা বাঁচিয়ে দিয়েছে । যেমন একবার একটি  
অট্টালিকার শ্যাভেলিয়ার ওর মাথায় পড়তে যাচ্ছিলো ।  
বলাবাহুল্য ভৌতিক কাণ্ড ছিলো সেটা ।

আমি খুব মিশুক । মুহুর্তেই জমিয়ে বসলাম । টুরের  
পরে একটি জাপানি রেস্টোরাঁতে ঢুকে সুশির অর্ডার দিলাম  
। ও কিন্তু কিছু খেলোনা । শুধু এক কাপ কফি ছাড়া ।  
বললো : বাড়িতে তিউই অপেক্ষা করবে ।

আমার সঙ্গী একটু কৌতুহলী বেশি । জিজ্ঞেস করেই বসলো  
: -তিউই কে ?

জানা গেলো সে এক রাজকন্যে । অ্যাব অরিজিন প্রিন্সেস ।  
১৮২০ নাগাদ তার মৃত্যু হয়েছিলো । আজ এই কায়াহীন  
রাজকুমারী আসে পিটারের কাছে , নিয়মিত ।

সন্ধ্যা হলেই তার নগরপাড়ের ছোট্ট বাগানে ঘেরা বাড়ি ঘিরে  
ফেলে গাঢ় কুয়াশা । কুয়াশা জান্তব হয় ।

বাড়ির সমস্ত কাজ করে তিউই । খাবার বানানো , ঘর সাফ  
এমন কি বাগান সাফও ।

দেখে শুনে রাখে পিটারকে । তাই ওর ছায়া শরীরের মায়া  
কাটাতে পারেনি পিটার ।

কাজেই ডিনারে ওর রান্নাই খাবে । সুশি নয় । তাতেই  
দুজনে খুশি । নাহলে অভিমান হবে রাজকুমারীর । সে বড়  
অভিমানিনী ।

তার দেহহীন প্রেমের কথা শুনে অবাক হলাম আমরা ।  
ভাবলাম : বিদেশেও প্ল্যাটোনিক লাভ হয় ।

বেশ কয়েকবার বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে ঘোষ্ট ট্যুর করতে  
এই কোম্পানির সঙ্গে বেশ জমে উঠলো । স্বভাবতই:  
পিটারের প্রসঙ্গ উঠলো একজন দক্ষ গাইড হিসেবে ।

জানা গেলো : পিটার নপুংসক ।

হয়ত তাই তার মনে আলোড়ন তুলেছে অশরীরি তিউই ।  
 প্রেম সাগরে বৈঠার ছলাং ছলাং শব্দে ভেসে চলেছে নাবিক  
 বিহীন নৌকা ।

অদেখা চালিকা কৃষ্ণভামিনী এলোকেশী তিউই মন জুড়ে  
 আছে পিটারের , গাইড করছে ভালোবাসার জগতে ,  
 আমাদের ঘোন্ট টুরের প্রকৃত গাইডকে ।

## ডাইভোর্স

জন মুখাজ্জী আর আভা বিশ্বাস প্রায় সমবয়সী ।। শৈশব  
 থেকেই একে অন্যের প্রেমে পাগল । গলায় একে অন্যের  
 রক্ত বিন্দু দিয়ে তৈরি লকেট ঝুলিয়ে ঘোরেন । হাতে হাত ।  
 গালে চুমু । একদিন বিয়ে করেন ।

জন ব্যবসাদার । আভা টিচার ।

ধীরে ধীরে জন বড়লোক হল । তাই আভাকে হারালো ।  
 অ্যাভা সোসালিস্ট ভাবধারায় বিশ্বাসী । কাজেই বিচ্ছেদ হয়ে  
 গেলো ।

এত ধন সম্পদ , প্রাচুর্য আভার সইলো না । সে ধনীদেব ঘৃণা  
 করে । তারা কৃপণ , ধান্দাবাজ , সুবিধেবাদী , নিষ্ঠুর ।  
 জনও শেষ পর্যন্ত ওদের দলে নাম লেখালো ???

আভা বাই পোলারের রুগী । হঠাৎ হঠাৎ ভীষণ মুড অফ  
 হত । কখনো বা কামরসে টেটিল্লুর হয়ে উঠতো । এরকম  
 একসময় সে ন্যুড পোজ দিলো একটি ম্যাগাজিনের জন্য ।

ম্যাগাজিন প্রকাশিত হল । বিকশিত হল আভা - বিদ্যার  
 রক্ষক ।

লোকে নিন্দে করবে এবার । কারণ সে একজন শিক্ষিকা ।  
কী প্রচার করবে এই ছবি - ছাত্র সমাজে ?? তাই বুঝি  
লাজ বাঁচাতে এক ব্যবসায়ী কিনে নিলেন ম্যাগাজিনের  
সমস্ত কপি । যাকে আজ হৃদয়হীন আখ্যা দিয়েছিলো  
একদিন । পরাজিত আজ সারা ঘরে ছুটে বেড়াচ্ছে : দু হাত  
তুলে চিৎকার করছে : নগ্ন উল্লাসে-----

আই হেট ইউ , আই হেট ইউ --আই হেট ইউ-----

## নবযুগ

২০১১ সালের এক বসন্তের দুপুরে ( বেশ গরম ) ডোনা  
বেড়াতে এসেছে পৃথিবীতে । গিয়েছিলো মহাকাশযানে করে  
মঙ্গলে কিছুটা সময় কাটাতে । সেখানেই দেহ রাখে । আর  
ফেরার সময় স্পেস শিপ নিয়ে এসেছে মঙ্গলের ধুলো বালি ।  
সেই বালুকণা থেকে ডিএন এ বার করে সৃষ্টি করেছেন  
এক মানবী , বৈজ্ঞানিকেরা , নাম ডোনা ।

বলরামের যেমন মাথায় বাড়ি মেরে স্ত্রী রেবতীকে বেঁটে  
করতে হয়েছিলো সেরকম কিছু ডোনাকে করতে হয়নি  
তবে অবাক হয়েছে সে , ভীষণ ।

সে দেখছে তার ফেলে যাওয়া ধরিত্রী আর আজকের  
পৃথিবীর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ । সে গিয়েছিলো  
১৯৮০ নাগাদ । এখন অনেকেই তাকে পাগল বলে ক্ষেপাচ্ছে  
। কারণ তার মূল্যবোধ শিষ্টাচার ইত্যাদি একেবারেই ভিন্ন ।

ও দেখছে যে আজকাল বাড়ি বিক্রি করে দেবার পরে রাতারাতি দ্বিতীয় চাবি দিয়ে খুলে বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে মালিক । কেন-না সে ভোগ করতে অক্ষম কাজেই আর কেউ যেন না পায়, অর্থ নেওয়া সত্ত্বেও । অফিসে জুনিয়ার ভালো কাজ করছে দেখে বস বাস ভাড়া করে জুনিয়ারের বাড়িকে হেড অন কলিশানে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিচ্ছে কিংবা নিজের শিশু সন্তানকে গায়ে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে জীবন বীমার অর্থ দাবী করছেন । ডোনা অবাক বলে লোকে তাকে পাগল বলে ক্ষেপাচ্ছে । ডোনাকে ভর্তি করে দিলো পাগলা গারদে । ডোনা অসহায় । নির্বাক । নিরুপায় ।

প্রতিভাবানেরা সবাই গারদের আড়ালে । দুনিয়া চালাচ্ছে এক দল ১৯৮০-র পাগল ও পথভ্রষ্ট মধ্যমেধার মানুষ ।

## ঈগল

মোনাফানা সিন্হা । Product of Troubled childhood  
-বেশ নাম করা ফিজিসিষ্ট । সমাজে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি পায় । থাকে দক্ষিণ ভারতে । হৈ হুল্লোড়ের শহর চেন্নাইতে । সে শৈশব থেকেই ঈগলের মতন , ছোট ভাইবোনেদের ভাগ ছিনিয়ে নিয়ে জীবন শুরু করেছে । পরে ক্লাসমেট , বন্ধু ও সহকর্মী ।

নিজের ছোটবোনকে আজও ফোন করে বলে : *তোর মতন হতশ্রী মেয়েকে যে কি দেখে তোরা বর বিয়ে করলো ! তোকে সে ভালোবাসেনা , বাড়ির চাকরানী করে রেখেছে ।*

বাইরের জগতে অবশ্যই তার খুব সুনাম- ভদ্রমানুষ হিসেবে ।

কিছুদিন আগেই পড়শি দেশ একটি মারাত্মক ভাইরাসের আক্রমণে প্রায় শূন্য ।

সবুজ সবুজ উলের বলের মতন এই ভাইরাস বাতাসে বেড়ে কোটি গুণ হয়ে মানুষ ও জীবের শ্বাসরোধ করে মারে । কোথা থেকে এই ভাইরাস এলো এই নিয়ে অনুসন্ধান হলেও আজ অবধি কিছু জানা যায়নি । জানা যায়নি যে

ল্যাব থেকে ভাইরাস চুরি করে দু'রাত্নাদের বেচে দিয়েছিলো মোনাফানা। পন্ডিত, ভালোমানুষ বৈজ্ঞানিক।

মোনাফানার আরেকটি দিক আছে। সে নারীবাদী তাই একই সঙ্গে চারজন পুরুষকে নিয়ে থাকে। এর মধ্যে একজন বৃদ্ধ বিপত্তীক প্রফেসরও আছেন। পাঁচজনে মিলে থাকে একটি বাড়িতে। বুড়ো একা তাই সাথী চাই, একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক তাই লবি চাই, একজন অপদার্থ বেকার কিন্তু জিম করে সুঠাম - তার পিগি ব্যাঙ্ক চাই আর শেষজন আঁতেল কবি। একটু অন্যধরণের জিনিস তাঁর জীবনে করা চাই যাতে ভক্তরা বাহা বাহা করে। এই একটু জরা হটকে!

মোনাফানার আরেকটি অদ্ভুত শখ হল রাতের আঁধারে ছদ্মবেশে, পুরনো রাজাদের মতন হেঁটে ঘুরে বেড়ানো ও দেখা লোকে তার সম্পর্কে কী বলে।

মোনাফানা দেখতে পায় এত নাম যশ, পুরুষকে বগলদাবা করে, চাকর করে রাখা সত্ত্বেও লোকে ওকে সম্মান দেয়না। দেয় তুলসী তলায় প্রদীপ দেওয়া টাইপের মেয়েদের। তাদের সঙ্গেই বাসা বাঁধতে চায়। অবাক লাগে ওর। ওকে তারা মন্দ বলে। স্বেচ্ছাচারী বলে।

মগডালে উঠে বুঝতে পারে : ঈগল একটিই ভালো। সব মেয়েরা ঈগল হতে চায়না।

তারা ময়না কিংবা কাকাতুয়াতেই সন্তুষ্ট। মেয়েরা মা। মাতৃত্ব বহন করতে গেলে বুঝি ঈগলের থেকে শালিক টিয়া হওয়াই ভালো।

\*\*\*\* অবশেষে মোনাফানা ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। ভাইরাস কুকর্মে।

অবাক কাড, ওর চার চারজন পুরুষ সাথীর একজনও দেখা করতে আসেনি ওর সাথে।

এমন কি সমবেদনাও জানায় নি।

তারাও বলেছে : ও স্বেচ্ছাচারী। ফিমেল শাভিনিষ্ট পিগ  
.....!!!!

## মাতৃত্ব

সেলিব্রিটেড অভিনেত্রী কুসুম থাপা মা হতে চলেছেন। থাপা ভারতের প্রথম বিশ্বসুন্দরী। নেপাল থেকে দিল্লীতে এসে বাসা বাঁধেন তাঁর পিতা। পরে ভারতের সিটিজেনশিপ নিয়ে নেন। মেয়ে মেডিক্যাল পড়তে পড়তেই পুরোপুরি নেমে যান সিনেমায়। অপরাধ এই অভিনেত্রীকে নিয়ে মিডিয়ার উদ্ভাদনার শেষ নেই। কখন কাশলেন, কখন হাঁচলেন সব ডিট্রো কাগজে বার হয়। সম্প্রতি এই নায়িকা বিয়ে করেছেন আরেক বন্দি অভিনেতার স্টার পুত্রকে। বিয়ের পর থেকেই খবর বেরোচ্ছে যে কুসুম মা হতে চলেছেন। বহুবার খবর প্রকাশিত হবার পরেও মা না হতে পারায় লোকে মনে করে সে মা হতে অক্ষম। মিস ক্যারেজ হয়ে যাচ্ছে, বার বার।

ভারতীয় পাঠকের কাছে কেউ মা না হলে সে বাঁজা। আজকাল যেমন অনেক আধুনিক স্বেচ্ছায় মা হন না। তাঁরা জীবনকে উপভোগ করতে চান। এঁরা মধ্যবিত্ত সমাজে ব্রাত্য। গসিপ প্রেমীও তো সেই মধ্যবিত্তই। কাজেই তাঁরা কুসুমকে বাঁজা আখ্যা দিয়ে দিয়েছেন। আসল সমস্যাটা কুসুমের স্বামীর। তার স্পার্ম কাউন্ট অত্যন্ত নো।

সেলিব্রিটিদের জীবন জনসমক্ষে থাকে তবুও এই সংবাদ কেউ জানেনা।

বাজারে ছড়িয়ে দে না ওর নামটা, আমরা মেয়েরা দোষী হব কেন? বলে কুসুমের বাস্কবী ডেলা।

আমি পারবো না ডেলা। আমার নেচার ওটা নয়। আমি দেখবো চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে কী করা যায়।

তা হল চিকিৎসা। মা হতে চললেন কুসুম। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লো খবর তাঁর শুশ্রূষার লেখা ব্লগের কল্যাণে। সবাই চমকিত। এবার হবেই। সুন্দরী কুসুম ফুলে ফেঁপে উঠছেন। গাইনিরা হাসপাতালের দরকারি অপারেশন ও কাজ বন্ধ করে কুসুমের ব্যাপারে প্রেডিকশান করছেন এমনই সেলিব্রিটি হবার মজা।

জ্যোতিষীরা বলছেন : এই শিশু হবেন আরেক স্টার। হলিউড ও তার কপিক্যাট বলিউড দুটো কাঁপাবে। অর্থাৎ আগে আসলে তারপরে নকলে অভিনয় করবেন। দেখতেও হবে দুর্দান্ত। তবে কেউ বলছেন মেয়ে হবে কেউ বা ছেলে।

যথাসময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। চারিদিকে হৈ চৈ। সবাই তাকে একটিবার দেখতে চান। দা লিটল ওয়ান।

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে ঘটলো অঘটন। জানা গেলো মৃত সন্তানের জন্ম দিয়েছেন কুসুম।

কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি এই সন্তানকে বাঁচাতে পারেন নি চিকিৎসক গণ।

মুগ্ধাইয়ের মাহিম ও মাতৃঙ্গা প্ৰেশানের মাঝে হিজড়া বস্তিতে বেজে ওঠে বাদ্যযন্ত্র। আজ সাজ সাজ রব। বস্তিতে আনা হয়েছে একটি শিশুকে যাকে নিয়ে এসেছে একটি স্পোর্টস কার। সঙ্গে এসেছে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও অর্থ। বাচ্চার বাড়ি থেকে দাবী করা হয়েছে তাকে যেন ভালোভাবে মানুষ করা হয়। লাগে টাকা দেবে বাড়ির মানুষজন।

## অণু উপন্যাস

### মানুষ থেকে মাকড়সা

এক প্রফেসর নাস্তিকদের জন্য একটি বাইবেল লিখেছেন।

মানুষের ভালো করো ও ভাবো এই তার মূল মন্ত্র। বিখ্যাত কবি, দার্শনিক, লেখক, সমাজ সেবকদের নানান উক্তি ও জীবনবোধ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নাস্তিকদের এই অভিনব গীতা। খুব গর্বিত ততিয়ানা এইজন্য। ওর প্রাক্তন স্বামী এক অন্ধুত ধর্মে আস্থা রাখেন। মধ্যযুগীয় এই ধর্মে মৃতপ্রায় শিশুকে পর্যন্ত রক্ত দেবার উপায় নেই। তা বিষ বলে পরিগণিত হবে ও ঈশ্বর রাগ করবেন। সবসময় : গড ও গড - ততিয়ানাকে ক্লান্ত করে। মানুষের কি মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই? প্রশ্ন করে নিজেকে। তাই তো তার সৃষ্টিতে সে সবসময় মানুষের কথা বলে। ততিয়ানা একজন কার্টুনিষ্ট

। অপূর্ব তার তৈরি কার্টুন । যেন চরিত্রগুলি নেমে আসে বাস্তবে । চারপাশে ঘোরাঘুরি করে । কথা বলে । জানায় রাগ অনুরাগ । ওদের সঙ্গে কথা না বললে কী করে প্রাণ পাবে কার্টুন ?

প্রতিভাময়ী ততিয়ানার পিতা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী । প্রচুর দানধ্যান করতেন ।

একটা সময় তাঁর পূর্বজরা ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে গ্রামের বাড়িতে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করার চেষ্টা করেন । কিন্তু মিরাকেল ! বেঁচে যান উনি । একটা দিক যদিও প্যারালাইজড হয়ে যায় ।

ডাক্তার বলেছিলেন : উনি যদি পড়ে যেতেন তাহলে ওঁনাকে বাঁচানো যেতো না । যেহেতু পড়েন নি তাই বেঁচে আছেন । বহুমানুষ সেইসময় পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন যেমন বরাবর হয়ে থাকে । তারা ততিয়ানার বাবার দ্বারা উপকৃতও । অথচ ! একজন তো প্রাণপন চেষ্টা করেছিলেন যাতে তার পিতা কোনোরকম মেডিক্যাল সুবিধে না পান এবং ব্যবসা ফেল করে যায় । সেই মানুষটির নাম জেসন ফলসাম । প্রকৃতির অদ্ভুত খেল । জেসনের কন্যা শিল্পী রোজালি আজ ততিয়ানার প্রিয় বান্ধবী । ততিয়ানা ক্ষমা করতে পারে । ভুলে যেতে পারে সব দুঃখ । তাই তো তার প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে দেখা হলে আজও কথা বলে । হ্যারল্ড নাম তার । নিষ্কর্মা । একটিও টাকা দেয়না সন্তান পালনের জন্য অথচ তাঁদের চার

চারটে সন্তান । শেষ দুটি যমজ ও তার আগে দুজন আছে । ছেলেমেয়েরা বাবার সঙ্গে থাকে মাঝে মাঝে ।

বাবা এমনি খুব কড়াধাঁচের । মেয়ের বন্ধুদের বাড়িতে ঢুকতে দেন না । মেয়ে ডোনা তাই বিরক্ত । একবার পালিয়ে গিয়েছিলো বাড়ি থেকে বন্ধুদের ডেরায় । ততিয়ানা ফেরৎ নিয়ে এসেছেন । এখন সে ওঁর কাছেই থাকে ও মেয়ের মতন কার্টুন বানাবার চেষ্টা করে । মা ও মেয়ে দুজনেই দারুণ সুন্দরী । ঠিক যেন একজোড়া ডু ব্যারিমোর ।

অসম্ভব জ্বালাতন করা পরিত্যক্ত স্বামীকে দেখলে সে হেসে কথা বলে । ভালোমন্দ জানতে চায় ।

শুধু পরামর্শ দেয়না । হ্যারল্ড বলে : আই অ্যাম টায়ার্ড অফ ইওর অ্যাডভাইসেস !

ততিয়ানার কার্টুন খুব বিকায় । চ্যানেলে , বইতে । এরকম থ্রি ডায়মেনশ্যন্যাল কার্টুন কার না ভালোলাগে ? খুব ক্রিয়েটিভ ও সাহসী কার্টুন তার । কয়েকটি রেখায় ধরা বাস্তব দেখতে লাগে দারুণ । ফুটে ওঠে অসময়ের বোধে ও চেতনায় ।

এখন যার সঙ্গে সে থাকে তার নাম গ্যারি । গ্যারি এখন ফুলের ব্যবসা করে । নিজের বাগানে চাষ করে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে । কিছু সবজিও থাকে । টাটকা সবজি কিনতে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন । ততিয়ানার পরামর্শেই সে আজ নিজ পায়ে দাঁড়িয়েছে । আগে ছিলো এক



নেগেটিভ চিন্তাধারী ডিখারি। থাকতো শপিং মলের সামনে।  
বারোয়ারি টয়লেট ব্যবহার করে দিন গুজরান করতো।  
থেতো সামান্যই কারণ সে ডায়বেটিক। সরকারের কাছ  
থেকে কিছু ভাতা পেতো যা জমিয়ে দিতো। দিনগত  
পাপঙ্কয়ের মাঝেই একদিন দেখা পেলো- কার্টুনিষ্ট  
ততিয়ানার।

ততিয়ানা দেখলো লোকটি অপূর্ব স্ব-রচিত ও সুরারোপিত  
গান গায় ও ছবি আঁকে। আলাপ হতেই জানতে পারলো যে  
সে আগে একটি থিয়েটার দলের হয়ে কাজ করতো যারা  
পথনাটিকা করে। তার শরীরে ডায়বেটিস বাসা বাঁধে খুব  
অল্প বয়সে। অত্যন্ত বেশি সুগার হওয়াতে সে ভেঙে পড়ে।  
জীবনের প্রতি উৎসাহ হারায়। কয়েকবার আত্মহত্যাও  
করতে যায়। শেষে না পেরে গানে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়।  
ততিয়ানা তাকে কাউন্সেলিং করে নিয়ে আসে সঠিক পথে।  
তার কাউন্সেলিং - কে ঘৃণা করতো প্রাক্তন স্বামী হ্যারল্ড।  
কিন্তু গ্যারি মেনে নিলো। চুপ করে শুনতো। জন্ম হল এক  
নব মানবের। বায়েটা নামক এক নতুন ইঞ্জেকশানের  
কল্যাণে তার ডায়বেটিস এত কমে গেলো যে কাজে কর্মেও  
যথেষ্ট উৎসাহ পেতে লাগলো। একটি কুৎসিত টিকটিকির  
লালা থেকে তৈরি এই ওষুধ। **Gila monster** এই  
টিকটিকির নাম। আজ আর গ্যারি ভিক্ষুক নন। একজন  
ফুল ব্যবসায়ী। আর অবসরের গায়ক, বাদক।

ক্রমে দুই গুণী মানুষের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হল। ধীরে ধীরে দুটি  
সৃষ্টিশীল মন সুর বাঁধলো একই সরগমে।

ওরা বিয়ে করবে, শিঘ্রই। এরকমই হয়ত হত। যদি না  
ততিয়ানাকে খেয়ে ফেলতো সেই ভয়ানক মাকড়সা! হ্যাঁ,  
ইস্টারের ছুটিতে টাসমানিয়া বেড়াতে গিয়ে এই কাণ্ড।  
বিখ্যাত ক্র্যাডেল মাউন্টেনের একটি গুহাকে হোটেল করা  
হয়েছে। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রইলো আবার নতুন  
ধরণের হোটেলও হল। সেই হোটেলেই উঠেছিলো  
সেলিব্রেটেড কার্টুনিষ্ট ততিয়ানা ডেব্রায়েনস্কায়া।

ডিনারের পরে শুয়ে পড়েছিলো সে। খাবার আগে বায়েটা  
ইঞ্জেকশান নিয়ে হালকা খেয়ে শুয়ে পড়ে বন্ধু গ্যারি-ও।  
হঠাৎ আক্রমণ। বিশালাকৃতি কালো মাকড়সা যার দেহটি  
স্বচ্ছ লাল।

মাথা অনেক বড়। চোখ গোল গোল, সবুজ। অনেক পা।  
রণ পায়ের মতন। ধীরে ধীরে পা গুলি দিয়ে জাপটে ধরে,  
কুরে কুরে খেয়ে ফেললো পূর্ণ একটি নারীকে। এরকম  
কার্টুন অনেক করেছে ততিয়ানা কিন্তু তার জীবনে এই  
ভয়ানক ঘটনা ঘটবে ভাবেনি। শত শত মন্দ মানুষকে খেয়ে  
ফেলছে মাকড়সা, দেখিয়েছে কার্টুনে যা লোকে বলে ওর  
স্বপ্নে পাওয়া আসলে ততিয়ানার উর্বর মস্তিষ্কেরই ফল।  
কিছুই করার ছিল না গ্যারির। প্রাণ ভয়ে না পালালেও তফাৎ  
গিয়েছিলো।

**হোটেল পক্ষ থেকে জানানো হল নিছক দুর্ঘটনা এটি।**

আসল সত্য প্রকাশিত হল অনেক পরে । আত্মগ্লানিতে । আত্মগ্লানিতে প্রায় পাগল হয়ে যাওয়া প্রিয় বাস্কবি রোজালি জানালো সব । তাতিয়ানার চলে যাবার পর কটি প্রাণীর নিষ্প্রাণ জীবন দেখে যেন তার ইনার ভয়েস জেগে উঠলো । বললো : এবার প্রাণ ঠান্ডা হয়েছে তো তোমার ? যাও , ক্ষমা চাও ! মাফ চাও ওদের কাছে , নাহলে পরপারে কী জবাব দেবে ? সেখানে তো সব হিসেব নিকেশ মেটাতে হবে !

শিল্পী রোজালি টাসামানিয়া গিয়েছিলো ছবি আঁকতে । প্রিয় ট্যাসিতে , অজি এই শিল্পী ছিলো অনেক মাস । পাহাড় , নদী , সমুদ্র ভারি ভালোলাগতো । ছবি তুলে তারপরে আঁকতো ।

অনেক প্রদর্শনী করেছে , বিক্রি হয়েছে বহু চিত্র , চড়া দামে । আর্ট গ্যালারিকে ডোনেট করেছে কিছু । এই শিল্পী একদা এক জঙ্গলে দেখে এই অদ্ভুত মাকড়সা । মুহূর্তে খেয়ে নিচ্ছে এক একটি ভেড়া ও গরু । আজব জীব ! দেখতে জঘন্য । দেখলেই অভক্তি জাগে । শিকারের সময় ভয়ানক এই জীব শিকারের পরেই নুইয়ে পড়ে একদম ছোট্ট একটি সূর্যমুখী ফুলের মতন সাইজে । পরের শিকার ৪৮ ঘণ্টা পরে করে আবার । মাথায় এলো প্ল্যান । বহুদিন ধরেই রাগ তাতিয়ানার ওপরে । সে নিজে ভালো শিল্পী হলেও তাতিয়ানা সেলিব্রেটেড কার্টুনিস্ট । তার এত নাম , যশ । তার ওপর সে যেন ওকে করুণা করে । করুণা করেছে । দয়া করেছে । তাদের দুই পরিবারের ফাটল জোড়া লাগানোর আছিলায় বলতে চেয়েছে : এই রোজালি , দেখ তুই কোন ধরনের শিল্পী আর আমি

কত উদ্ভাঙ্গের আঁকিয়ে । আমি কার্টুনে নতুন ধারা এনেছি । আর তুই ? ছবি তুলে আঁকিস । বড় বড় শিল্পীদের ছবির রেক্রিকা বানাস । তোকে ক্ষমা ব্যাতিত আর কি-ইবা করতে পারি আমি ও আমার পরিবার ।

মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে । ইদানিং সে সারাটা দিন বিড়বিড় করতো । তাতিয়ানার কুশপুতলিকা দাহ করতো তার অজ্ঞাতে , মনে মনে । সামনে অবশ্যই হাসিমুখ ।

পুলিশের হাতে ধরা দিতে হল অবশেষে । তাকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হল মানসিক হাসপাতালে । কারণ মাননীয় জজের মতে সে অসুস্থ । তার অসংলগ্ন কথা শুনে মনে হয় এই খুনের কারণ মানসিক অসুস্থতা যা জন্ম দিয়েছে মাত্রাহীন -প্রতিশোধ স্ফূর্তির । রোজালি ধরা পড়ার পর শান্তি এসেছে কিছুটা তাতিয়ানার গুণ পরিবারে । ওরা খুশি মায়ের আততায়ী ধরা পড়েছে বলে । ওদের প্রিয় রোজালি মাসিকে ওরা ক্ষমা করেছে মায়েরই মতন । কারণ ওরা শুনেছে যে ওদের মা ও তার পূর্বজরা মানুষকে ক্ষমা করাই পরম ধর্ম বলে মানতেন । ওদের বাবার সঙ্গে ওরা থাকে । মেয়েটি এখন অনেক পরিণত । মায়ের মৃত্যু তাকে রাতারাতি পরিণত করে দিয়েছে । সে ঘরের কাজ করে ও ছোটভাই বোনকে দেখে । তার বাবা হ্যারল্ড কাজ করে ফিউনেরাল ডাইরেক্টার হিসেবে । তার কাজ মৃত ব্যক্তির সৎকারের সমস্ত আয়োজন করা ও সেই মতন প্ল্যান করা । সরকারি ভাতাও পায় ছেলেমেয়ের জন্য । আর মাঝে মাঝে আসে গায়ক , বাজিয়ে ও সুরকার গ্যারি । তার সুরের জাদুতে মুগ্ধ বাঙালি মেয়ে জিনিয়া ।

জিনিয়া ঘোষ । কলকাতা থেকে এখানে পড়তে এসেছিলো ।  
এখন একটি মেডিক্যাল সেন্টারে কাজ করে ডায়বেটিক  
এডুকেটর হিসেবে । সে শিশু বয়স থেকে ডায়বেটিসে  
আক্রান্ত । জুভেনাইল ডায়বেটিস । বেঁচে আছে ইনসুলিন  
ইঞ্জেকশনের কল্যাণে । লং ডিস্টেন্স দৌড়ে পদকও পেয়েছে  
স্টেট লেভেলে ।

ভালোবেসে ফেলেছে গ্যারিকে । তার স্পিরিট দেখে । গ্যারির  
জীবনকাহিনী ভারি ইম্প্রেস করেছে তাকে । যে এই স্কুলিঙ্গ  
জ্বালিয়েছে তাকে তো আর দেখতে পাবেনা কোনদিন ।

ইমোশন্যাল বাঙালীর ঠোঁট দুটি কঁপে ওঠে চাপা অভিমানে ।  
অভিমান নাকি আশীর্বাদ ?

## মিসেস সিং য়ের গল্প

বিদেশে আসা ইন্ডক ভারতীয় রেস্টোরাঁতে খেয়ে খেয়েও মনের  
মতন খাবার মেলেনা । আমার বাড়ির কাছে একটি নতুন  
রেস্টোরাঁ খুলেছে । নাম বগ্লে বগ্লে । নাম থেকেই মালুম হল  
যে মালিক পাঞ্জাবী । গিয়ে দেখলাম মালিক নন মালকিন ।  
মিসেস সিং । কেতাদম্বুর মালকিন সুদূর পাঞ্জাবের এক গ্রাম  
থেকে এসেছিলেন । আজ তাঁর চার চারটি জনপ্রিয় রেস্টোরাঁ  
। সদ্যজাত নম্বর চারটি আমার বাড়ির বেশ কাছে । গরম  
গরম মসলা চায়ে ও পাকোড়ার প্লেট নিয়ে কথা হচ্ছিলো ।  
মিসেস সিং এসেছিলেন তিন সন্তানকে নিয়ে । বড়টির বয়স  
তখন ২৯ । সে প্লাস্টিং এর কাজ -যা এদেশে যথেষ্ট পয়সা  
পেতে সাহায্য করে ও লোভনীয় কাজ তাই নিয়ে আসে ।  
বাবা মারা যেতেই মায়ের অর্থাৎ মিসেস সিংয়ের বিয়ে ঠিক  
হয় পাঞ্জাবী রেওয়াজে ওর পুত্রসম দেবর ইন্দরজিতের সঙ্গে  
যাঁর বয়স প্রায় প্লাস্টির পুত্র সুরজিতের মতন । এই প্রথার  
নাম চাদর ডালনা অথবা কারেওয়া । পুরাতন দিনে  
পরিবারে সম্পত্তি ধরে রাখার জন্য এই প্রথা চালু হয়েছিলো  
। একুশ শতকের মিসেস সিং বিব্রত , লজ্জিত । পলায়ন

করেন তিন সন্তানকে নিয়ে । এই দেশে লো ফিল জবের জন্য থার্ড ওয়ার্ল্ড থেকে লোক আনা হত । কাজেই ডিসা পেতে অসুবিধে হয়নি সুরজিতের । আসার পর ধীরে ধীরে রেস্টোরাঁ খোলেন মিসেস সিং । আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন বৃষ্টিস্নাত রাতে । আমি তো এখানে ড্রাইভ করিনা । ডায়বেটিসের জন্য লাইসেন্স পাইনি । গাড়িতে বসে আমরা তিনজন । সিং ও তাঁর পাশে আমি আর কনিষ্ঠ পুত্র পেছনে । হঠাৎ সাহেবী কায়দায় সে বলে ওঠে : আই নিড সাম ওয়াডার ( ওয়াটার-জল )

মিসেস সিং একটু সামনে ঝুঁকে পড়তেই ছেলে পেছন থেকে বলে ওঠে : হোয়াট আর ইউ ডুয়িং মম ? আর ইউ ফার্টিং ( ফার্টিং ) মম ?

সিং আমার দিকে চেয়ে বলেন : নো মাই ডিয়ার সন । জলের বোতল এক হাতে পিছিয়ে ছেলেকে দেন ।

আমাকে বলেন : জানেন এখানে এসে কম হেনস্তা হইনি । গৈয়োভুত ছিলাম কিনা । প্যাক্টি পরতে অসুবিধে হত । ভেতরে ঢুকে যেতো । সেকি কষ্ট । হাঁটতে চলতে । একবার শর্টস্ ফেটে গিয়েছিলো জন সমক্ষে । প্রস্রাব করে দিয়েছিলাম টয়লেটে , মহিলাদের ড্রেসিং রুমে -না বুঝতে পেরে । তবুও হিম্মৎ হারিনি । সব শিখে নিয়েছি, মুখ বঁকিয়ে দাঁত চিপে ইংরেজি বলা পর্যন্ত । এখন তো আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছি । বড় ছেলে বিয়ে করেছে মালটা দেশের এক মেয়েকে । ওর নাম কারমেন । ও টেলারিং শপ

চালায় । নিজের মেয়ে পড়ে কলেজে । ওর আই আই টির প্লাস্বারের সঙ্গে বিয়ে দেবো । দেশ থেকে খুঁজে আনবো । এখানে আসার জন্য নিশ্চয়ই রাজি হয়ে যাবে । পেছন থেকে ঐচোরে পাকা হাফ সাহেব ছেলে বলে ওঠে : হোয়াই ? হোয়াই অন অর্থ আ ব্লাডি ইন্ডিয়ান ? হোয়াই মম ? দেয়ার আর লটস্ অ্যান্ড লটস্ অফ হোয়াইট এঞ্জিনিয়ার্স অভার হিয়ার । ডু ইউ সিনসিয়ারলি থিংক আই আই টিয়ান্স হ্যাড আ বিগার কক দ্যান আদার এঞ্জিনিয়ার্স ?

অপ্রস্তুত মিসেস সিং পাঞ্জাবী ভাষায় কী বললেন বুঝলাম না । সামনে ঝুঁকে প্যাক্টিটা টেনে বার করছেন আবার মনে হল । আমার মনে হল গ্রামে লাঙল ও ট্র্যাক্টর চালানো ভদ্রমহিলা যদি এইভাবে এসে সেটেল হতে পারেন ও লড়ে যেতে পারেন তাহলে আবাংলার মানুষও পারেন । ইংরেজি বলতে ও বুঝতে অসুবিধে হয় বলে অনেকে এখানে আসতে ভয় পান বাংলার গ্রাম থেকে । অন্যরাও ডিসকারেজ করেন । মিসেস সিং কে বলতেই বললেন : আপনি তো লেখেন । লিখে ফেলুন আমার কথা দেখবেন বুদ্ধিমান বাঙালি সাহস করে চলে আসবেন । স্বাধীনতা যুদ্ধে কে লড়েছিলো ? বাঙালি ও পাঞ্জাবী ছাড়া ? কে ? কে ?

ঘ্যাঁচ- করে ব্রেক কসে গাড়িটা থামলো আমার বাড়ির সামনে । প্রতিবেশী , মিড অফ দা উইকে তুমুল পার্টি করছেন । গান ভেসে আসছে : *You're my love you're my angel* ---মিসেস সিং সাহেবী কায়দায় গানের

বাকি অংশ গেয়ে উঠলেন : ড্যাডীজ হোম , হো হো হো  
ড্যাডীজ হোম ।

মিসেস সিং অনেক ভেঙেছেন , গড়েছেন । শুধু জানতে  
পারেন নি যে আই আই টি-তে প্লাস্টিং কোর্স পড়ানো হয়না ।  
হয় কি ? হয়ত গো -মুখুখু আমি জানিনা ।

## মিসেস সিংয়ের বন্ধুর গল্প

সমুদ্রের কিনারায় এক পুরুষ রাত ১০টা নাগাদ  
ছুবিকাঘাতে আহত হয়েছেন । প্রচণ্ড স্ট্যামিনা থাকায় গাড়ি  
চালিয়ে বলিউডি চং-এ গেছেন হাসপাতালে ।

শুনলাম মিসেস সিংয়ের কাছে । উনি চলমান খবরের  
কাগজ । আমরা বলি এনক্ষতরধ জয়শ-----মহিলা পরে যা  
জানতে পেরেছেন তা হল সেই পুরুষের সাথে ছিলেন  
মহিলার বান্ধবী কঙ্গনা । সে নাকি ইদানিং বাড়ি থেকে বার  
হত --একটি স্প্যাস্টিক সংস্থায় কাজ করতে যাচ্ছি বলে ।  
আসলে অন্য পুরুষের সঙ্গে চলাচলি করতো । বললেন  
মিসেস সিং । বলেন : কি দুনিয়া পড়েছে দেখুন ।

মহিলার পতিদেব নিপাট ভালোমানুষ । অথচ তাঁকেই  
ঠকাচ্ছে তাঁর ঘাড়ে চেপে আসা বৌ ! ওহ্ ডিয়ার !

গরমাগরম কফি ও ল্যাম্ব চপ খেতে খেতে আমি কৌতুহলী ।  
পরেরদিন নয় কয়েক সপ্তাহ বাদে জানলাম : তদন্তে জানা  
গেছে যে পতিদেব আগেই টের পান বৌয়ের কীর্তি । তাই

ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে বোঁকে মারতে গিয়ে গুন্ডা ভুল বশত:  
ওর প্রেমিককে ছুরি মেরে বসে। বোঁ খোশমেজাজে ঘরে  
ফিরছে দেখে পতিদেব চাপা রাগে গজগজ করেন। প্রেমিক  
অবশ্যই মরেন নি। আঘাত সেরে গেছে। তবে মহিলার স্বামী  
বেশ কিছুকাল জেলের ঘানি টানবেন অ্যাটেমপট টু মার্ডার  
চার্জ।

বলি : পাপীর পৌষ মাস আর ভুভুভোগীর সর্বনাশ !!

নিজের প্যান্টি আলগোছে টেনে মিসেস সিং -ও হেসে ওঠেন  
আমার শেষোক্ত রসাত্মক। সেদিকে চেয়ে ওঁর পাকা ছেলে  
স্বভাব সিদ্ধ কায়দায় বলে ওঠে :

ফাক হার মম , ফাক দ্যাট লেডি । মম হোয়াই গালস  
উইয়ার প্যান্টি ? ডু ইউ থিংক দে ফিল সিভিয়ারলি চিন্ত  
ইন দেয়ার প্রাইভেট পার্টস , আই মিন দা হোল -উইদাউট  
প্যান্টি ?

হি ক্যান বি ভেরি ডার্টি উইদ ওয়ার্ডস , মিসেস সিং বিব্রত ।  
হবেন নাই বা কেন ??? আদতে ভারতীয় তো ।।।।

## প্রতিবিম্ব

অস্ট্রেলিয়ায় বাস করে তারা সানিয়াল (সান্যাল)। পেশায়  
লেখক। তার বাঙ্কবী গাঙ্গী একটি পত্রিকা চালায়। কোনো  
বড় পত্রিকায় গাঙ্গীর লেখা বার হয়না। অথচ গল্পের পুটি  
খুব ইউনিক। সম্প্রতি সে এসেছে অস্ট্রেলিয়া। স্থায়ী  
বাসিন্দা। এলাকায় থাকেন কমলাবালা পাল। ৬০ এর  
ওপরে বয়স মহিলার, একটি বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন  
চালান। বাঙালী লেখক কবি থরে থরে আসেন ওঁর বাড়ি।  
ওঁদের নিয়ে ঘুরতে যান। এক একটি দর্শনীয় স্থান দেখা  
হয়ে যায় বিনা খরচে, বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের স্কন্ধে  
আরোহণ করে, নিন্দুকে বলে। এইভাবে ঘোরা হয়ে যায়  
গোটা দেশ। নিন্দুকেরা আরো বলে যে পুজোর নাম করে  
সুন্দর সুন্দর প্রতিমা কলকাতার কুমারটুলি থেকে কিনে  
এনে ভাসান না দিয়ে বাড়িতে রেখে দেন। টেরাকোটার মন্ডপ  
আনা বিশেষ অর্ডার দিয়ে সেই পুজোর নামে। তারপর তার  
নিবাস কমলাবালার বাড়ি।

লেখকেরাও বিগলিত, বিশেষ ট্রিট পেয়ে, আসছেন বিচিত্রা  
, ক্যানবেরা নিয়ে যাবো।

এবার আসছেন সুজয়, মরুভূমি দেখা হয়নি, ওদিকেই  
যাবো!

বীরঙ্গনা চট্টোপাধ্যায় আসবেন ,প্রদেশে নিয়মিত লেখেন ।  
নিষে যাবো অ্যালিস স্প্রিংস । আমাদের দেখা হয়নি কিনা ।

ওহ! মৌ-উ-নীল , মৌ-উ-নীল , ঔঁকে নিষে যাবো  
অ্যাডলেড । কালো ছোট্ট শর্টস পরে পশ্চাৎদেশ ঈষৎ দুলিষে  
নেচে ওঠেন বৃদ্ধা কমলাবালা ওরফে ক্যামস্ । বড় বড়  
লেখক/লেখিকাদের নাম ধরে ডাকা এই সাধারণ লেখক ও  
মহিলার লেখা আজকাল নিয়মিত বার হয় নামী পত্রিকায় ।  
এতটাই যে উনি নিজেও জানেন না কখন কোথায় কোনটা  
বার হচ্ছে ! তারা সানিয়াল দেখতে পায় যে লেখাগুলি গাঙ্গীর  
মতন ইউনিক । গাঙ্গীর লেখা তো কোথাও বার হয়না !  
কমলাবালা পালের আজকাল বড্ড নাক উঁচু হয়ে গেছে ,  
উনি নিজেকে পপুলার রাইটার ভাবছেন । আর অন্যের  
লেখা কপি করছেন ?

গাঙ্গীর বাড়ি সানিলায়ের বাড়ির ১০০ হাতের ভেতরে ।  
একদিন সুযোগ পেয়ে দেখা করলো । বললো : তোমার  
লেখা তো কেউ ছাপেনা অথচ কমলাবালা পালের লেখা  
ছাপে । উনি তো তোমার অনুকরণ করেন ।

গাঙ্গী একটু হাসে । হেসে বলে : আমি ঔঁনাকে পার্মিশান  
দিয়েছি । আসলে ২০০০ -৩০০০ ডলারে উনি আমার  
গল্প কিনে নিষে যান । আমার টাকার প্রতি কোনো টান  
নেই , উনিই জোর করে আমাকে ফিস্ হিসেবে দেন ,  
আমাকে নাকি নিতেই হবে , আমার জন্য উনি লিখতে

পারছেন । আমার আর কি ? এই সৃষ্টিগুলি স্বীকৃতি পেলেই  
হল ,তাতেই আনন্দ !

ব্যর্থ লেখকের হতাশার কথা নাকি উচ্চস্তরের মানব  
সন্তানের শান্তিবাণী ?

তারা সানিয়াল ভেবেই চলে , একাকী , সমুদ্রপাড়ে বসে ।  
শান্ত চেউ-এ পড়েছে চাঁদের প্রতিবিম্ব । দূর থেকে জেটির  
কাঠামো ধরে হেঁটে আসছে একটি অবয়ব । হয়ত মিসেস  
কমলাবালা পাল - গাঙ্গীর প্রতিবিম্ব ।

## সাংবাদিক

সাংবাদিক রতনতনু ঢালি অসম্ভব অলস। ঘরে বসে নেট ঘেঁটে ঘুটে রিপোর্ট তৈরি করেন। সম্পাদক কিছু বলেন না কারণ ওঁর লেখার চাহিদা খুব বেশি। তরবারির মতন ধারালো ভাষা ও মাখনের মধ্যে দিয়ে ছুরি চালানোর মতন সাবলীল রচনা। জার্নালিজমের বেশ কিছু পুরস্কারও পেয়েছেন। সম্প্রতি তাঁকে যেতে হয়েছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে, উগ্রহানা নিয়ে রিপোর্ট লেখার জন্য। ঢালি বাবু অতদূর যাননি। সিমলারা দিকে পরিবার নিয়ে বেড়িয়ে ফেরার সময় দেখেন একটি জায়গায় তাঁবু পড়েছে ও উগ্রপন্থীর দল সেখানে আস্তানা গেড়েছে। এক আর্মি অফিসার ও কয়েকজন জওয়ানকে ধরে এনে উত্তম মধ্যম দিচ্ছে। ঢালি বাবু খুব খুশি। সব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট লেখেন। ছাপাও হয়। এবং একইদিনে অন্য পেপারে বার হয় যে :

সুরাগ কাশ্যপের নতুন উগ্রপন্থী নিয়ে সিনেমা দহুসাং - এর শুটিং হল সিমলার কাছে। নিখুঁত লোকেশন ও মেকআপে বোঝা যায় যে এটা কোনো সিনেমার প্লট।

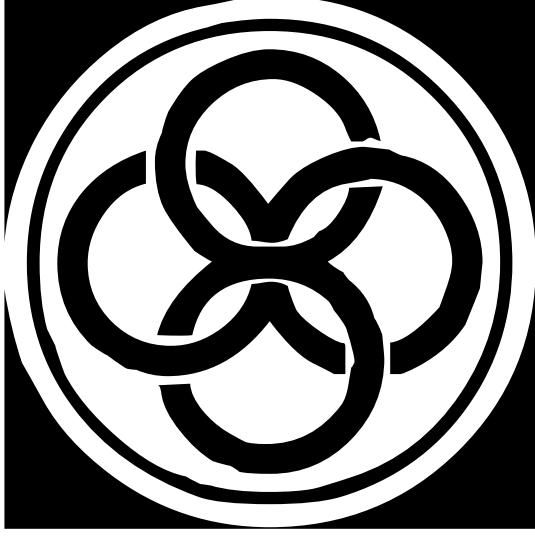
ছবি হিট হবেই বলেই ফিল্ম পন্ডিতেরা মনে করছেন।

হলই বা প্যারালেল সিনেমা !

খবরটি পড়ে লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলেন তুখোড় গৃহবন্দী সাংবাদিক রতন তনু ঢালি।

সম্পাদকের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটি ঢালের আজ তাঁর বড্ড প্রয়োজন।





## অণু উপন্যাস

### রূপালি চেউ

এইদেশে খ্রীস্টমাস হয় গরমকালে । ক্রিসমাসের পার্টি । যে যা উপহার পেয়েছেন তাই ভাগাভাগি করে নেন ও আনন্দ ফুটি হয় । এরকম এক পার্টিতে পুনরায় মিলিত হয়েছেন ১০ বছর আগে ডাইভোর্স হয়ে যাওয়া স্বামী স্ত্রী লরা ও জো । একসঙ্গে ছিলেন ২২ বছর । তারপর সেপারেশান হয় ও পরে বিচ্ছেদ । তিন ছেলেমেয়ে আছে । নিজেদের তিন মেয়ে ও পালিত পঙ্কু এক ছেলে । দুই মেয়ে বিবাহিত ও তাদের কাছ থেকে লরা ও জোয়ের প্রাপ্তি মোট তিনটে নাতি নাতনি । পঙ্কু ছেলেটি থাকে লরার সঙ্গে । সে সপ্তাহে চারদিন একটি ছোট শপে হিসেবের কাজ করে । অন্য দুদিন পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের ক্যাম্পে যায় । সেখানে এদের মতন মানুষদের জীবনের নানান ওঠাপড়া সম্পর্কে অবহিত করে সেভাবে ট্রেন করা হয় যাতে কোন পরিস্থিতিই ঐরা ভেঙে না পড়েন । অসহায় হয়ে না পড়েন । ছেলেটি খুবই ভালোমানুষ । বাবা জো-কেই বেশি ভালোবাসে । কিন্তু

পরিস্থিতির চাপে থাকতে হয় মমের সঙ্গে । লরা আর পুরুষ  
সঙ্গ করেন নি । জো-কে যে ভীষণই ভালোবাসতেন ।  
এখনও অতিথিদের কাছে কত প্রশংসা করেন জো-য়ের ।  
তবে সন্তানদের আড়ালে । ওদের সামনে কোনো আলোচনা  
করেন না , বাবার সম্বন্ধে ।

জো আবার বিয়ে করেন নি কিন্তু ঔনার এক রুশ পার্টনার  
ছিলো । অ্যানা । সে ঔনার বড় মেয়ের বয়সী । ওদের একটি  
ছোট ছেলে আছে । দিমিত্রি । আজকাল অ্যানা আর জোয়ের  
সঙ্গে থাকেনা । কারণ তাকে ছোটবেলায় এক বৃদ্ধ মোলেস্ট  
করেছিলো । জোয়ের মধ্যে সে যেন ঐ বৃদ্ধের ছায়া দেখে ।  
তাই জো-কে ছেড়ে চলে গেছে । দিমিত্রি একা বাবার কাছে  
থাকে । দিনের বেলায় যায় ডে -কেয়ার সেন্টারে । বাবা  
বিকলে বাড়ি ফেরার সময় ওকে নিয়ে আসেন । অ্যানা এক  
লেকচারারের সঙ্গে আজকাল থাকে । জো শুনেছেন যে ওরা  
বিয়ে করবে । দিমিত্রির কোনো খবর অ্যানা নেয় না ।  
বান্ধাটি প্রায়ই মাকে খোঁজে । সরল চোখে জল, টলমল  
পায়ে হেঁটে বেড়ায় ফায়ার প্লেসের কাছে : মাম মা -মাম মা  
! কোলে তুলে নেন জো । চোখ মুছিয়ে দেন ।

জোয়ের বড় মেয়ে নিকোলের আছে ফিটের ব্যামো । তবুও  
তাঁর জামাতা ওকে বিবাহ করেছেন । এক সঙ্গে দুটি ছেলে  
হয়েছে । যমজ । টিম ও জিম নাম তাদের । ভারি বিচ্ছু  
কিন্তু দাদুকে খুব মানে । ভালোবাসে । ওরা জোয়ের প্রাক্তন  
স্ত্রী লরার চোখের মণি । বড় মেয়ে জামাই-ও খুব খুশি ।

দ্বিতীয় মেয়ে একা থাকে । কোনদিন বয়স্কেউ ছিলোনা ওর ।  
একটু লাজুক । পেশায় শিক্ষক । আর ছোট মেয়ে বছর  
খানেক হল বিয়ে করেছে এক অ্যাফ্রিকান কে । অ্যাফ্রিকান  
কুইজিন নিয়ে একটি রেস্তোরাঁ চালান ঔরা - বার্বাডোজ  
নাম । সেখানে কাঁচা মাংসের এক কুইজিন পাওয়া যায় ।  
কারণ ওরা কাঁচা মাংস খায় । সেখানে একমাত্র সফেড  
চামড়া জো-য়ের কনিষ্ঠা কন্যা ক্যাথরিনা । এই ছেলেগুলি  
দেখতে কালো ও বড়সড় , ভয়ানক হলেন্ড খুবই উদ্র , নম্র  
ও বিনয়ী । ক্যাথারিনার কন্যার নাম মলি । মলি ইডিথ  
হলোলা । ইডিথ আদতে জোয়ের মায়ের নাম ।

সমুদ্রের ধারে ওদের খামারবাড়ি । এখানে পার্টি । সবাই ব্যস্ত  
হাসি ঠাট্টায় ।

বালুকাবেলায় এক কোণায় দাঁড়িয়ে ক্লান্ত সমুদ্র দেখছেন  
লরা । মনে পড়ে যায় বালি ভ্রমণের কথা । তখন ছিলেন  
জো , বান্ধারা ও সদ্য দত্তক নেওয়া পঙ্কু সন্তান রব ।

রব পঙ্কু বলে অনেকে নাক শিটিকে ছিলেন তখন । কিন্তু  
ঔরা স্বামী স্ত্রী ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । ওকে তাঁরা গড়ে  
তুলবেনই । তাই শত বাধা আসা সত্ত্বেও হার মানেন নি ।  
কিন্তু সেই জো-ই একদিন জুয়ার নেশায় ধার দেনা করে  
হারিয়ে গেলো । অন্য নারীতেও গেল । প্রথম প্রথম ক্ষমা  
করে দিয়েছিলেন লরা । উনি খুবই ব্যক্তিত্বময়ী । কাজ  
করেন মেট্রিন হিসেবে । একটি হাসপাতালে । জো-কে  
ভালোবেসেছিলেন কলেজ জীবনে । তারপর বিবাহ বন্ধনে

আবদ্ধ হন। সেই ভালোবাসা যখন বিট্টে করে, তার শয্যা নিয়ে আসে অনাহত অতিথি ঘরের ছাদ ভেঙে পড়ে। লরার-ও পড়েছিলো। তবুও উনি মার্জনা করে দেন কিন্তু দিন দিন তা বাড়তে থাকে। অনেক নারীতে যান জো। হয়ত সর্বস্ব হারানোর কথা মনে হয়নি। শেষে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সন্তানেরা বাবাকে খুবই ভালোবাসে। লরা ওদের বাধা দেননি বাবার কাছে যেতে। ওরা যায়। নিয়ম করে। সব থেকে বেশি যায় পঙ্কু ছেলে রব। লরা কী পেরেছেন জোকে ভুলতে? কেউ জানে না।

দূর থেকে ভেসে আসা একটি মিঠে তানে চিন্তায় ছেদ পড়ে। একটি শিশু তাঁকে আঁকড়ে ধরেছে।

কচি কচি হাতে ঝঁর লম্বা দেহটি ধরে : মম্মা -মম্মা --- করে ডাকছে।

চেউয়ে ভেজা ফ্লুদে দিমিত্রি। মাকে খুঁজছে আজ কদিন ধরেই। একটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে ওর ড্রেস হাতে একটু দূরে দাঁড়িয়ে জো। মাথায় বরফ পড়েছে। কপালে বলিরেখা।

যেন বুঝে উঠতে পারছেন না কী করণীয়।

এক পলক কিছু ভাবলেন লরা। তারপর দিমিত্রিকে কোলে তুলে নিয়ে সহস্র বছরের প্রাচীর ভেঙে এগিয়ে যান জোয়ের দিকে। হাত বাড়িয়ে বলে ওঠেন : ইজ ইট পসিবল ফর

ইউ টু কন্ট্যাক্ট ম্যারেজ লইয়ার অ্যান্ড ল্যান্ডম্যান অন মাই বিহাফ? আই ইউল টেক কেয়ার অফ দিমিত্রি।

গভীর সমুদ্রের কিছু অভিমাত্রী রূপালী ঢেউ এসে যেন অকস্মাৎ ভেঙে পড়ে জোয়ের পদতলে।

## মা

নেপালের পাহাড়ি স্বচ্ছ বনভূমি। রঙীন পোশাক, গোলাপী মেয়েরা। আপেল সুন্দরী নায়িকা রঙ্গনা। বলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রী, প্রাইজ পেয়েছেন অনেক। নিষ্ঠা সহকারে সমাজ সেবাও করেন, হিউমান ট্রাফিকিং নিয়ে কাজ। নেপালি মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় সীমান্তে, দেহ ব্যবসার কাজে। সেই নিয়ে গলা ফাটান আন্তর্জাতিক ফোরামে। সমস্ত ভূমিকাই পালন করেন সাফল্যের সাথে, মাত্র ৪৫ বছরেই।

শুধু হয়নি একটি বিবাহ। বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে তবুও রূপসী হওয়ার দরুণ জনগণের নয়নের মণির জন্য পাত্র পাওয়া বিচিত্র নয়।

কাজেই নেপালের ব্যবসাদার বীরভদ্রের সাথে বিয়ে হল পারিবারিক যোগাযোগের মাধ্যমে। তার বয়স মাত্র ২৪। আমেরিকা থেকে পাশ করে এসেছেন। নেপালের রিচ অ্যান্ড ফেমাস লিষ্টে আসেন। বিয়ে হয়ে গেলো উত্তাল নাচ ও গানে। বলিউডি তারকারা আসমান থেকে নেমে এলেন হিমালয়ে। নিকষ কালো আঁধারে হোটেলের লবি যেন সলমা চুমকি খচিত। বিয়ের পরে বাসর তারপর ফুলশয্যা। বহুবার রতিক্রীড়ায় অভ্যস্ত রঙ্গনার কাছে এগুলি খেলার নামান্তর মাত্র। শুরু হল রগরণে যৌনক্রিয়া। ২৪ হাঁফিয়ে যায় ৪৫ এর কাছে। রূপসীর নরম নভীমূলে ডুবে গেলো পতিদেবের যৌবন। ডোরের আকাশে যখন প্রথম আলোর বেশ তখন মন খুলে গল্প শুরু করে রঙ্গনা। তার বাবা নেপালের মন্ত্রী। শৃঙ্গুর অভিজাত, ধনবান ব্যবসাদার। মদ্যপ বীরভদ্র উগড়ে দিলো নিজ জন্ম ইতিহাস। মদ্যপান রত রঙ্গনাও। নেপালের খুবই জনপ্রিয় পানীয়। কেউ কিছু মনে করেনা। বীরভদ্র পালিত পুত্র। তাকে অনাথ আশ্রম থেকে তুলে এনেছিলেন তার বাবা। এই সত্য গোপন আছে। আশ্রম মন্দিরা বেশ দূরে। ফারপিণ্ডে অবস্থিত। স্মৃতির সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা পথ। ফারপিণ্ডে মন্দিরাতেই তো দিয়ে এসেছিলো তাকে। ২৪ বছর আগেই এক মেঘমন্দিরিত দুপুরে। গগনে গগনে ডেকেছিলো দেয়া। লাফিয়ে উঠে বীরভদ্রের বাম জঙ্ঘায় গাঢ় বাদামী তিলটা পরিষ্কার করতে থাকে বার বার। পাগলের মতন। হ্যাঁ সেই তিল! লাভ সাইন আকারের আশ্চর্য তিল।

যা দেখে বন্ধুদের বলেছিলো : দেখ এ যে আমার ভালোবাসার সন্তান তার প্রমাণ এই অদ্ভুত আকৃতির তিল।

চিরটাকাল উচ্ছ্বল সে। কোনো পুরুষ বাঁধতে পারেনি তাকে। আড়ালে নাম হয়ে গিয়েছিলো ম্যান ইটার। কত পুরুষের ঘর ভেঙেছে তার জন্য।

গল্ফার, ফুটবলার, পিকার, পাকা অভিনেতা, ইন্টেলেকচুয়াল কেউ বাদ যায়নি। তার মায়ায় আবদ্ধ হয়েছেন অনেকেই তারপর তাদের হেলায় ফেলে চলে গিয়েছে সে অন্য পুরুষে।

আজ সে বাঁধা পড়েছে স্থায়ী ভাবে এক পুরুষে, বিবাহ ডোরে। গ্রহণ করেছে নিজের অজান্তে নিজেরই-----!!

## লামা

হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে কলকাতার মেয়ে ইরানি। কাকে যেন খুঁজছে তার উদাসী আঁখি। ডন্টু -- ডন্টু। আকাশপানে চেয়ে ডাকছে।

এক লামার নাম। সিকিমের এক গুস্তায় তার বাস। সে গিয়েছিলো কলকাতা ঘুরতে। সেখানেই আলাপ কল সেন্টারে কাজ করা ইরানির সাথে। ডন্টুর সরল চোখ ও লাল ভেলভেটের মতন ঠোঁট ইরানিকে পারস্যের গোলাপ পাইয়ে দিয়েছিলো।

লামা হলেও ভালোবাসতে জানে চু। কলকাতা ঘুরিয়ে দেখালো ইরানি। গেলো মন্দারমণি। চু সাগর দেখবে। কল সেন্টারের কৃত্রিম জীবনে সরলতার ছোঁয়া আনে চু। ধীরে ধীরে শারীরিক শুদ্ধতা হারালো ইরানি। কিছুটা গিয়েছিলো কল সেন্টারেই বসের হাতে বাকিটা নিলো ডন্টু। লামা হলে কি হয় শয্যায ডন্টু রয়েল বেঙ্গল টাইগার। মাংস খাবলে খেতে চায় দয়িতার। রক্তাক্ত করে দিলো ইরানিকে। ভোরের আলোর লাল জীবন্ত গোলাপ সে এখন। এরপর লামা গেলো নিজ নিকেতন। কথা দিলো বড় লামার সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসবে সংসার জীবনে। কিন্তু আসেনা।

ইরানি কৈশোরে স্বপ্ন দেখতো তার প্রেম কাহিনি হবে ডুয়ার্সে চা বাগানের পটভূমিকায়। বৃষ্টি বন্দি তারা এক বনবাংলোয়। ঝাম ঝাম বরষনে নগ্ন ইরানিকে কোলে নিয়ে ওর প্রেমাস্পদ ধুয়ে নিচ্ছে প্রাকৃতিক গলিত হিমে।

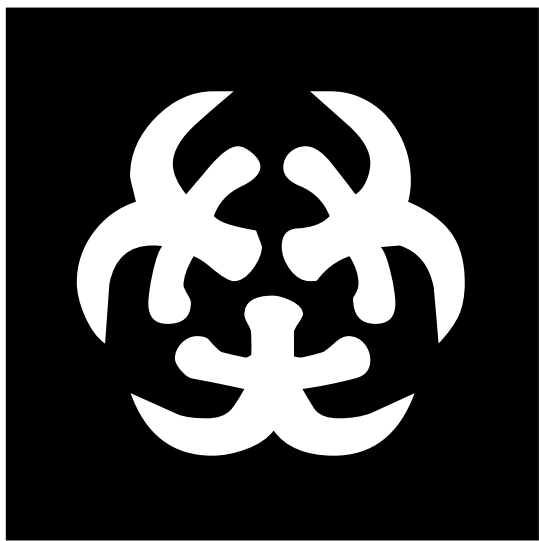
পবিত্র করে নিচ্ছে। অমৃত করে নিচ্ছে ওদের ভালোবাসাকে।

পাহাড়িয়া পথে ছুটে চলেছে এক পাগলিনী। আলুথালু বেশ। জটাধরা কেশ।

বড় বড় পাইন গাছ ভেদ করে ভেসে আসছে চীংকার ডন্টু-চু-চু।।।

শীত কাপড়ে আপাদ মস্তক মোড়া এক পথচারী দয়া পরবশ হয়ে ছুঁড়ে দিলো রুটির টুকরো। মাটি থেকে খামচে তুলে নিলো ইরানি। দৃশ্যটি লেখিকাকে বহুদিন আগে পড়া একটি গল্পের কথা মনে পড়িয়ে দিলো যেখানে একটি পাহাড়ি মেয়ে নাম নিনি এইভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো এক কলকাতার প্রেমিককে।

লেখিকার মনে হল : প্রকৃতি কারো কাছে খণি থাকেনা। নিষ্ঠুর হল আজ সরল হিমালয়। পাহাড় প্রতিশোধ নিলো নগরের কাছে।



**The End**

# Proof

Printed By Createspace



Digital Proofer